প্রথম অধ্যায়

রাজবংশী জাতির ইতিহাস

ইতোপূর্বে ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে যে উত্তরবঙ্গের উপভাষার বাচকগোষ্ঠী হিসেবে রাজবংশী ছাড়াও একাধিক সম্প্রদায় রয়েছে। তবে জনসংখ্যার দিক থেকে এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে রাজবংশীই সর্ববৃহৎ এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলেও উত্তরবঙ্গের অধিবাসী হিসেবে অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি অপেক্ষা প্রাচীনতর। এই কারণে অনুমান করা চলে যে রাজবংশীই উত্তরবঙ্গের উপভাষা ব্যবহারকারী সর্বপ্রাচীন জনসমাজ, অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি এই বিচারে অপেক্ষাকৃত নবাগত। উল্লিখিত কারণে বর্তমান নিবন্ধে একমাত্র রাজবংশী জাতির ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

যথোপযুক্ত ঐতিহাসিক উপাদান এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার অভাবে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার অধিবাসী রাজবংশী জাতির ইতিহাস আজ অবধি সুস্পষ্ট রূপ লাভ করতে পারেনি। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কালে সরকারী উদ্যোগে ভারতের ইতিহাস রচনা, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল অনুসন্ধান, জনতত্ত্ব নিরূপণ, ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা এবং সমীক্ষার যে কাজ শুরু হয়েছিল, উল্লিখিত জাতিটির ইতিহাস সম্পর্কে অনুসন্ধান কার্য চালাতে গেলে সেই সমস্ত গবেষণা-কর্মের ফলাফলের উপর নির্ভর করতে হয়। এই কাজের আর একটি সহায়ক উৎস হ'ল রামায়ণ, মহাভারত এবং অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালে রচিত বিভিন্ন পুরাণ, উপপুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থ। প্রাক্‌স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা পরবর্তী কালের বাংলা ও বাঙালি জাতির ইতিহাস ও তাদের সম্পর্কিত গবেষণা-কর্মের মধ্যে মাঝে বিক্ষিপ্ত ভাবে এই জাতির ইতিহাস সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। বাঙালি জাতির ইতিহাস সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্যের এটি তৃতীয় সহায়ক উৎস। রাজবংশী জাতির ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জানা প্রথম বই হরকিশোর অধিকারীর 'রাজবংশী কুলপ্রদীপ'। আসামের গোয়ালপাড়া জেলার অধিবাসী হরকিশোর অধিকারী মূলতঃ শাস্ত্রীয় প্রমাণের উপরে ভিত্তি করেই রাজবংশী জাতির ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর বই আকারে পুস্তিকার সমগোত্রীয়। এর প্রকাশকাল ১৩১৫ বঙ্গাব্দ। এর পরে অবিভক্ত বাংলার দিনাজপুর জেলার অধিবাসী মনিরাম কাব্যভূষণ ১৩১৮ বঙ্গাব্দে 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় দীপক' এবং ১৩১৯ বঙ্গাব্দে 'পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় কুল দীপিকা' নামে দুখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। রাজবংশী জাতির ইতিহাস সম্পর্কিত অনুসন্ধান কার্যের অপেক্ষাকৃত সফল প্রয়াস ১৩৪০ বঙ্গাব্দে জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত উপেন্দ্র নাথ বর্মণের 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস'। দুর্ভাগ্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ নির্ভর ইতিহাস রচনার অসম্পূর্ণতা দূর করার

জন্য শ্রীঅর্পণ ১৩৭০ বঙ্গাব্দে এই গ্রন্থের আর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই পরিবর্ধিত সংস্করণে শাস্ত্রীয় প্রমাণের সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যের সংযোগে সংশ্লিষ্ট জাতিটির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এই পর্যায়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা হ'ল স্বর্গত চারুচন্দ্র সান্যালের 'দি রাজবংশীজ অব নর্থ বেঙ্গল' (এশিয়াটিক সোসাইটি, ক্যালকাটা, ১৯৬৫) গ্রন্থখানি। অবশ্য এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিকোণ পূর্ববর্তী সমস্ত প্রচেষ্টা থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু এই গ্রন্থেও রাজবংশী জাতির ইতিহাস সম্পর্কে রূপ-রেখা নির্ধারণের চেষ্টা রয়েছে। রাজবংশী জাতির ইতিহাস সম্পর্কে আর একটি গ্রন্থ হ'ল স্বর্গত পতিরাম সিংহ রায় 'কামতারাজ্যে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়' (কোচবিহার, ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ)।

ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত গ্রন্থ ছাড়া হাতে লেখা বিভিন্ন পুঁথিতেও রাজবংশী জাতির ইতিহাস সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এই জাতীয় পুঁথির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল দুর্গাদাস মজুমদার কর্তৃক পদ্যে রচিত, ১৭৬ পত্রে সমাপ্ত 'রাজবংশাবলী' (রচনা সমাপ্তি কাল ১২৭০ বঙ্গাব্দ) ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত রংপুর জেলার চাকলা ফতেপুরের অন্তর্গত ইটাকুমারী গ্রামের অধিবাসী কবি রতিরামের 'জাগসংগীত' (পুঁথিটির সঠিক রচনাকাল জানা যায়নি)। আসামের বৈষ্ণবধর্ম প্রচারক শঙ্করদেবের শিষ্য পণ্ডিত রূপনারায়ণ কর্তৃক অসমীয়া ভাষায় রচিত 'কামতেশ্বর কুলকারিকা' নামক গ্রন্থেও রাজবংশী জাতির ইতিহাস সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। রাজবংশী জাতির উদ্ভব, ভারতে প্রবেশ, অথবা ভারতই তাদের আদি বাসভূমি হলে প্রাচীন ভারতের মানচিত্রে এই বাসভূমির অবস্থান নির্ণয়, ভারতীয় আর্যভাষাকে নিজেদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে প্রাসঙ্গিকতার খাতিরে প্রাগুক্ত সূত্রগুলি উল্লিখিত হ'ল।

ভারতীয় জনতত্ত্ব সম্পর্কিত গবেষণার পুরোধাপুরুষ ডাঃ স্যার ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিলটন-এর উপরে ইংরেজ সরকার উনিশ শতকের প্রারম্ভে পূর্বভারতের অধিবাসীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ১৮০৭ থেকে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বুকানন এই তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যাপৃত থাকেন। কিন্তু সংগৃহীত তথ্যগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মন্টগোমারি মার্টিন বুকাননের সংগৃহীত তথ্য সমূহের উপরে ভিত্তি করে 'দি হিস্টরি, অ্যান্টিকুইটি, টোপোগ্রাফি অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস্ অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়া' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত বুকাননের রিপোর্ট অনুসারে বৃহৎ বোড়ো নরগোষ্ঠীর অন্তর্গত কোচ ও রাজবংশীরা মূলতঃ একই জাতি[১]।

---

(১) মার্টিন মন্টগোমারি, দি হিস্টরি অ্যান্টিকুইটি, টোপোগ্রাফি অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস্ অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়া, ১৮৩৮, পৃঃ ৫৩৮

বুকানন ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে সরকারী কর্মচারীদের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। উনিশ শতকের প্রথমদিকে বহিরাগত রাজকর্মচারীদের অধিকাংশই ছিলেন ছিলেন বিদেশী। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই স্থানীয় ভাষা ও কৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি তাঁদের মধ্যে ছিল না। এই কারণে যে সমস্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে বুকানন উল্লিখিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তার প্রামাণিকতা সম্পর্কে সংশয় থেকে যায়। আরও একটি কারণে বুকাননের প্রদত্ত রিপোর্টের যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে সংশয়িত হতে হয়। বুকানন মূলতঃ তৎকালীন উত্তরবঙ্গে উপনিবিষ্ট বহিরাগত বাঙালী, নেপালী, অসমীয়াদের প্রদত্ত তথ্যের উপরেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রাজবংশী সমাজের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য তাঁর কাছে যথোপযুক্ত গুরুত্ব পায়নি। রংপুর জেলা সম্পর্কে তাঁর প্রদত্ত রিপোর্টের পর্যালোচনা করলেই এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই রিপোর্টটি নিম্নরূপ:-

"In this district, by far most important and numerous of these tribes, by the Assamese, Nepalese and by all such Bengalis as are not under the influence of their chiefs, is called indiscriminately Koch and Rajbanshi, and the subdivision and distinctions which they themselves have introduced are considered as effusions of vanity and of no importance, the whole being though low and impure. This opinion is exceedingly disagreeable to their chiefs and many of them observe the Hindu law with such purity that the Mithila and Kamrupi Brahmins admit them to be real Sudras, but the Bengali hold them in the utmost contempt.

I have no doubt however that all the Koch are sprung from the same stock and that most of the Rajbansis are Koch".

---

(২৫) তদেব, পৃঃ ৪৪০

দেখা দেখা যাচ্ছে যে বুকানন তৎকালীন উত্তরবঙ্গে উপনিবিষ্ট বাঙালিদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। একটি শ্রেণী রাজবংশী সমাজপতিদের দ্বারা প্রভাবিত অন্যটি সেই প্রভাব থেকে মুক্ত। প্রকৃত অবস্থা যদি তা-ই হয়ে থাকে তাহলে এমন অনুমান সম্ভবতঃ ভ্রান্ত নয় যে ঐ সময়ে বহিরাগত বাঙালি-দের সঙ্গে স্থানীয় অধিবাসী রাজবংশীদের প্রাথমিক সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়ায় বাঙালিদের একটি অংশের সঙ্গে রাজবংশীদের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে যায়। এই অংশটিই খুব সম্ভব বুকানন কথিত রাজবংশী সমাজপতিদের প্রভাবযুক্ত বাঙালি। সুতরাং রাজবংশীদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর বাঙালিরা যে নিরপেক্ষ মনোভাবের পরিচয় দিতে পারেননি এমন অনুমানও করা চলে। দ্বিতীয়তঃ উনিশ শতকের প্রারম্ভে উত্তরবঙ্গের সদরদপ্তরে যে সমস্ত নেপালীর বসবাস ছিল তাঁরা মূলতঃ অফিস-আদালতের দারোয়ান বা ঐ জাতীয় অন্য কোনো পদে কাজ করতেন। তাঁদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটেনি। সুতরাং এই শ্রেণীর অশিক্ষিত লোকদের দেওয়া তথ্য কতখানি নির্ভরযোগ্য এ প্রশ্নের অবকাশ শেষ পর্যন্ত থেকেই যায়। সব শেষে বলা যেতে পারে অসমীয়াদের কথা। উনিশ শতকের উত্তরবঙ্গে অসমীয়াদের বসবাস মূলতঃ পুরোহিত বৃত্তির সূত্রে। বর্তমান উত্তরবঙ্গেও অসমীয়া পুরোহিতরা পৌরোহিত্য করে থাকেন। এই অসমীয়া পুরোহিতদের উত্তরবঙ্গে আগমনের পূর্বে রাজবংশী সমাজেরই একটি শ্রেণী তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতেন। এই শ্রেণীটি রাজবংশী সমাজে অধিকারী বলে পরিচিত। আসাম থেকে আগত ব্রাহ্মণরা যে রাজবংশীদের হিন্দু বলে স্বীকার করতেন বুকাননের রিপোর্টেই তা স্পষ্ট। শুধু তাই নয়, বুকানন তাঁর রিপোর্টে যে তথ্য লিপিবদ্ধ করেননি তা হ'ল এই যে এই ব্রাহ্মণরা রাজবংশীদের হিন্দু বলে স্বীকার করে যজুর্বেদীয় পদ্ধতিতে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। সুতরাং রাজবংশী এবং কোচ সমাজকে অভিন্ন বলে প্রতিপন্ন করে তাঁরা যে প্রকারান্তরে স্ববিরোধী আচরণ করবেন না এমন অনুমানই সঙ্গত। সেই সঙ্গে বুকাননের রিপোর্টে একথাও স্পষ্ট যে মিথিলা থেকে আগত ব্রাহ্মণরাও রাজবংশীদের হিন্দুত্ব স্বীকার করেছেন। তাহলে বুকাননের কর্মচারীরা কোন শ্রেণীর অসমীয়াদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন এ প্রশ্ন অমীমাংসিতই থেকে যায়।

একই গ্রন্থে সন্নিবেশিত বুকানন প্রদত্ত রিপোর্টের অন্যত্র বলা হয়েছে যে সমস্ত রাজবংশীই কোচ নয়, তবে তাদের অধিকাংশই কোচ। যে সমস্ত স্থানে তারা পালকি বহন করে পতিত হয়েছে সেখানে তাদের নাম কোচ। আবার তাদের মধ্যে যারা শূকর, মুরগী ইত্যাদি খেয়ে এবং পান করে আরো বেশী কলুষিত হয়েছে সেখানে তাদের পরিচয় হ'ল তাহোই বা পাড়োল।[৩]

বুকাননের প্রদত্ত রিপোর্টের এই অংশ সম্পর্কে বলা চলে যে রাজবংশীরা সম্পূর্ণভাবে কৃষিজীবি। সাম্প্রতিক কালে এই সমাজভুক্ত অপেক্ষাকৃত নিম্ন অর্থনৈতিক মানের অধিকারী ব্যক্তিদের কেউ কেউ

---

(৩) তদেব, পৃঃ ৫৪৩

হাল ধরাও কিংবা [illegible] উপজীবিকা হিসেবে গ্রহণ করলেও সাধারণভাবে এটি রাজবংশী সমাজের [illegible] জীবিকা নয়। [illegible] এই জীবিকা অবলম্বনকারীদের সাধারণতঃ এই সমাজে নিম্নবর্ণীয় বলে বিবেচনা করা হয়। উনিশ শতকের প্রারম্ভে এই শিকার [illegible] যে অপেক্ষাকৃত প্রবল ছিল একথা অনুমান করতে কোনো কষ্ট হয় না। তদুপরি জালোয়া বা মালোরা যে [illegible] পতিত রাজবংশী একথাও মেনে নেওয়া যায় না। রাজবংশী সমাজে জালোয়াই বলে পৃথক কোনো শ্রেণী নেই। জালোয়াই উত্তরবঙ্গে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি সম্প্রদায়, এবং তাদের জীবিকা হ'ল শূকর পালন। রাজবংশী সমাজে শূকরপালন সাম্প্রতিক কালেও একটি নিন্দনীয় কাজ বলে বিবেচিত।

বুকাননের রিপোর্টের [illegible] পর্যালোচনায় এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তৎকালে রাজবংশী সমাজের জাতিপরিচয় সম্পর্কে উত্তরবঙ্গের অরাজবংশী সমাজে যথেষ্ট মতবিরোধ ছিল এবং বুকাননের বাঙালী সমাজের একটি অংশের মতামত সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হয়েছে। বর্ণাশ্রম ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত সমাজে, যেখানে ব্রাহ্মণরাই যে কোনো সামাজিক বিধান দেওয়ার অধিকারী, সেখানে ব্রাহ্মণদের মতামতকে অগ্রাহ্য করার এই দৃষ্টান্ত নিঃসন্দেহে সংস্কারমুক্ত মানসিকতার দ্যোতক। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্পষ্ট যে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ও এক্ষেত্রে বুকানন দিতে পারেননি। তাছাড়া ভারতীয় [illegible] হিন্দুসমাজকে বহুধাবিভক্ত এবং দুর্বল করে দেওয়া ছিল ইংরেজ কূটনীতির অন্যতম অঙ্গ। এক্ষেত্রে বুকানন যে বহুপ্রচারিত এই কূটনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এমন অনুমান অসঙ্গত নাও হতে পারে।

রাজবংশী জাতি ভারতীয় হিন্দুসমাজেরই একটি অংশ অথবা বহিরাগত বৃহৎ বোড়ো নরগোষ্ঠীর একটি শাখা, এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নয়, কেবলমাত্র বুকানন প্রদত্ত রিপোর্টের যৌক্তিকতা বিচারের স্বার্থেই উপরিউল্লিখিত যুক্তিসমূহ প্রদর্শিত হ'ল। কারণ পরবর্তী ইংরেজ গবেষকরা ভারতীয় জনতত্ত্ব সম্পর্কে যে সমস্ত পরিসংখ্যানমূলক উদ্ভাবন করেছেন তার অধিকাংশেরই ভিত্তি বুকানন।

বুকাননের পরবর্তী ইংরেজ গবেষক বি, এইচ, হজসনের মতে কোচ সর্দার হাজো কোচ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। কোচরা তামুলিয়ান নরগোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং আর্যদের আগমনের পূর্ব থেকেই তারা উত্তরবঙ্গে বাস করত। হাজোর পৌত্র বিশ্বসিংহ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন এবং রাজবংশী বলে পরিচিত হন। তাঁর মতে কোচ এবং কুবাচ এই দুটি শব্দ সমার্থক। আসামের অধিবাসী কোচদের তিনি (১)কামতালি, (২)মাদাই এবং (৩) [illegible] কোলিতা এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। রংপুরের অধিবাসী কোচেরা তাঁর মতে (১) রাজবংশী এবং (২) কোচ এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত।[৪] অর্থাৎ উৎপত্তিগত দিক থেকে তিনি কোচ এবং রাজবংশীকে একই নরগোষ্ঠী সম্ভূত বলে বর্ণনা করেছেন।

---

(৪)হজসন, বি, এইচ, জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গাল, ১৮৪৯, ভল্যুম-১৮, পার্ট-২
পৃঃ ৭০৪-৭০৬

হডসনের পরবর্তী গবেষক ই, টি, ডালটন দেহাকৃতির দিক লক্ষ্য রেখে রাজবংশীদের অনার্য মংগোলয়েড দ্রাবিড় অথবা বৃহৎ ভুটিয়া নৃগোষ্ঠীর অন্তর্গত বলে চিহ্নিত করেছেন।[৫]

এইচ, বেভারলীর মতে কোচ, রাজবংশী এবং পলিয়া উৎপত্তির দিক থেকে একই নৃগোষ্ঠীর অন্তর্গত। তিনি মনে করেন যে রাজবংশী নামটি ভিত্তিহীন এবং সম্ভবতঃ রাজবংশীদের একটি অংশ অন্য জাতির লোক। নিম্নবঙ্গের রাজবংশীরা তীয়রদেরই একটি অংশ, কিন্তু দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং গোয়ালপাড়ার অধিবাসী রাজবংশীরা কোচ এবং পলিয়াদের সমগোত্রীয়।[৬]

কোচবিহার রাজ্যের একজন ডেপুটি কমিশনার ক্যাপটেন লেউইন-এর মতে কোচবিহার রাজ্যের অধিবাসীরা কোনো নির্দিষ্ট জাতির বংশধর অন্তর্ভুক্ত নয়। ভুটান দুয়ারের অধিবাসী মেচরা এক সময় দক্ষিণাগত অধিবাসীদের সংস্পর্শে আসাতে তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের প্রচলন ঘটে। কোচবিহার রাজ্যের অধিবাসীরা তাদেরই বংশধর। এই মতের যৌক্তিকতা একারণেই স্বীকার্য নয় যে দক্ষিণ দিক থেকে আগত নৃগোষ্ঠীর কোনো পরিচয় এতে নেই[৭] এবং মেচ রাজবংশীদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি উপজাতি। অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মেচরা সম্প্রতি জলপাইগুড়ি জেলার অধিবাসী। মেচ উপজাতির এই রক্ষণশীলতার জন্যই তাদের সঙ্গে অন্য কোনো রক্তের সংমিশ্রণ বিশেষ ঘটেনি। এই কথার সত্যতা তাদের গাত্রবর্ণ এবং দেহাকৃতির মধ্য দিয়েই প্রমাণিত হয়। পক্ষান্তরে রাজবংশীরা এই দুদিক থেকেই মিশ্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বলা যেতে পারে যে ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকেও মেচ ও রাজবংশীদের মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। মেচদের ভাষা হল তিব্বত-চীনা-ভাষার অন্তর্গত। পক্ষান্তরে রাজবংশীরা যে ভাষায় কথা বলে তা ভারতীয় আর্যভাষার অন্তর্গত। মেচদের সঙ্গে রাজবংশী সমাজের সামাজিক বা বৈবাহিক কোনোপ্রকার সম্পর্কই নেই। ধর্মীয় বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও দুটি সমাজের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

হান্টারের মতে কোচসর্দার হাজো পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কামরূপে একটি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পৌত্র বিশ্বসিংহ রাজকর্মচারী এবং প্রজাবৃন্দ সহ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন এবং কোচ নাম ত্যাগ করে রাজবংশী হিসেবে পরিচিত হন।[৮]

---

(৫) ডালটন, ই, টি, ডেসক্রিপটিভ এথনোলজি অব বেঙ্গল, ১৮৭২, পৃঃ ৮৯-৯২

(৬) বেভারলী, এইচ, সেনসাস রিপোর্ট অব বেঙ্গল, ১৮৭২, অনুচ্ছেদ-১, পৃঃ ১৩০

(৭) ক্যাপটেন লেউইন ইন কোচবিহার স্টেট অ্যান্ড ইটস্ ল্যান্ড রেভিনিউ সেটেলমেন্ট, রায়-চৌধুরী, এইচ, এন, ১৯০৩, পৃঃ ১২৫

(৮) হান্টার, ডব্লিউ, ডব্লিউ, স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল, ১৮৭৬, অনুচ্ছেদ-১০, পৃঃ ৪০২

আলোচনায় অন্যত্র হান্টার বলেছেন যে রাজবংশী নামটি, যা সাধারণভাবে রাজকীয় জাতিকে নির্দেশ করে, রংপুর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার কৃষিজীবি ও সম্পাবিত্ত অধিবাসীরাই গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে জাতিপরিচায়ক কোচ নামটি শ্রমিক এবং পালকি বাহকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।[৯] তাঁর মতে রাজবংশীরা অর্ধ হিন্দুকৃত আদিম উপজাতি।[১০]

এইচ, বি, রাওনি বলেছেন যে কোচদের মধ্যে হিন্দুদের অসবর্ণ বিবাহের ফলশ্রুতিতে কোচদের পূর্বতন আদিম অভ্যাস, রীতিনীতি ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে যায়। ফলে সব দিক থেকে তারা অন্যান্য উপজাতি অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বাঙালিদের নিকটবর্তী হয়ে পড়ে। এই ভাবে হিন্দু বা বাঙালিকৃত উপজাতির একটি অংশ হল রাজবংশী। এই রাজবংশীরা কালক্রমে হিন্দু দেব-দেবীর পূজায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এভাবেই হিন্দু রীতি-নীতিকে গ্রহণ করে। রাওনির বক্তব্য অনুসারে কোচ এবং হিন্দুর মধ্যে সংমিশ্রণের ফলে কোচ জাতিরই একটি অংশ হিন্দুকৃত হয়ে রাজবংশীতে পরিণত হয়।[১১] অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য আসলে হান্টারের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি মাত্র, স্বতন্ত্র কোনো সিদ্ধান্ত নয়।

এইচ, বি, রাওনির পরবর্তী গবেষক এইচ বলিউ-এর মতে কোচ ও রাজবংশীরা অভিন্ন এবং হিন্দু সমাজ বহির্ভূত একটি হিন্দুকৃত আদিম উপজাতি মাত্র। যেহেতু বৈকুণ্ঠপুর এবং কোচবিহার রাজ্যের রাজবংশ নিজেদের শিববংশীয় বলে দাবী করে তাই তাদের অনুকরণে রাজ্যের অধিবাসী প্রজারাও, তারা রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত, এই অনুমানে নিজেদের রাজবংশী বলে দাবী করে। তৎকালীন রাজবংশী সমাজের পক্ষ থেকে তোলা ক্ষত্রিয়ের দাবী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন যে এই দাবীর পেছনে কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি বা প্রমাণ নেই।[১২] মোটামুটি ভাবে দেখা যাচ্ছে যে বলিউ-এর এই সিদ্ধান্তও তাঁর পূর্ববর্তী গবেষকদের অনুরূপ।

কিন্তু এইচ, এন, কে, টি, সেনগুপ্ত-এর বক্তব্য উল্লিখিত গবেষকদের থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর মতে- "বৈষ্ণব এবং শৈব, এই দুই [illegible] শ্রেণীর রাজবংশীদের মধ্যে নানা বিষয়ে পার্থক্য রয়েছে। শৈব রাজবংশীরা কোচ মোঙ্গোলীয়ান বংশগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত [illegible]। উত্তর দিক থেকে আগত এই কোচদের সঙ্গে 'কুকি'-দের নানা বিষয়ে সম্পর্ক রয়েছে। এবং এরা রাজবংশী সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। পক্ষান্তরে বৈষ্ণব রাজবংশীরা দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত, কৃষিজীবি এবং রাজবংশী সমাজের

---

(৯) হান্টার, ডব্লিউ, ডব্লিউ, স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি অ্যান্ড কোচবিহার, ১৮৭৬, ভল্যুম-১০, পৃঃ ৩৪০-৩৪৮

(১০) তদেব, জলপাইগুড়ি-পৃঃ ২৫০, কোচবিহার-পৃঃ৩৩৯
(১১) রাওনি, এইচ, বি, ওয়াইল্ড ট্রাইবস অব ইন্ডিয়া, ১৮৮২, পৃঃ ১৪৩
(১২) বলিউ, এইচ, সেনসাস রিপোর্টস ইন্ডিয়া, ১৮৯১, ভোল্যুম-৩৮৭ জে, পৃঃ ২০

সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অংশ। উনিশ শতকের শেষভাগে রাজবংশী সমাজে যে ক্ষত্রিয় সমাজভুক্তির দাবী ওঠে সেই দাবী সম্পর্কে বেগায়েরও অবহিত ছিলেন। পরিশেষে রাজবংশী সমাজের ক্ষত্রিয় সমাজভুক্তির দাবী যে রংপুর ধর্মসভার অনুমোদন লাভ করেছিল তাঁর রিপোর্টে তাও উল্লিখিত হয়েছে।[১৩]

বেগায়ের-এর বক্তব্যের আংশিক সমর্থন মেলে ও, ডোনেল-এর মন্তব্যে। অবশ্য তিনি বেগায়ের-এর মত রাজবংশী সমাজকে দ্রাবিড় এবং মোঙ্গোলীয়ান, এই দুটি পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করেননি। তাঁর মতে রাজবংশীরা পূর্বদিকের গিরিপথ দিয়ে আগত মোঙ্গোলীয়ান নরগোষ্ঠীর তৃতীয় প্রবাহেরই একটি অংশ এবং মূল বাসস্থান থেকে অগ্রগমনের পরে তারা প্রথমতঃ চন্ডাল, দ্বিতীয়তঃ কোচ এবং শেষতঃ অহোম, এই তিনটি স্বতন্ত্র পরিচয়ে তিনটি পৃথক উপজাতিতে পরিণত হয়েছে। অর্থাৎ উৎপত্তির দিক থেকে তিনি সমগ্র রাজবংশী সমাজকে মোঙ্গোলীয়ান নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১৪]

পরবর্তী গবেষক এইচ, এস, রিজলের মন্তব্যে এই মত সমর্থিত হয়নি। বরং এবিষয়ে বেগায়ের-এর মতের সাথেই তাঁর সাদৃশ্য অপেক্ষাকৃত বেশী। তিনি বলেছেন যে পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ববঙ্গের অধিবাসী কোচ, কোচমান্ডি, রাজবংশী, পলিয়া এবং দেশী, এই কটি উপজাতি মূলতঃ দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত এবং তাদের মধ্যে সম্ভবতঃ মোঙ্গোলীয়ান রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে। রাজবংশী সমাজের ক্ষত্রিয় সমাজভুক্তির দাবী সম্পর্কে রিজলেও অবহিত ছিলেন। রিপোর্টে এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য নিম্নরূপ।

" উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক কোচ অধিবাসীরা নিজেদের রাজবংশী বা ভঙ্গক্ষত্রিয় বলে পরিচয় দেয়। তারা ধর্মানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে এবং ব্রাহ্মণমূলক আচার অনুষ্ঠানও পালন করে। সম্প্রতি তারা এই ভাবে ব্রাহ্মণমূলক গোত্র ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে শুরু করেছে। সেক্ষেত্রে বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে তারা বর্তমানে একটি কৌতূহলোদ্দীপক পরিবর্তনশীল অবস্থায় রয়েছে। যেহেতু তারা সকলেই এক গোত্রের(কাশ্যপ) অন্তর্ভুক্ত তাই তাদের মধ্যে একই গোত্রের ভিতরে বিবাহের প্রচলনও রয়েছে। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ সমাজে একই গোত্রের মধ্যে বিবাহ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। এই ভাবে তারা ব্রাহ্মণদের গোত্রব্যবস্থার প্রাথমিক নিয়ম লংঘন করেছে। সুতরাং রাজবংশীরা আসলে রাজবংশী নামের অন্তরালে কোচ মাত্র। তারা যে ক্ষত্রিয়দেরই একটি শাখা এমন দাবীর পেছনে কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। তাদের সঠিক পরিচয় হ'ল এই যে তারা দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত।[১৫] রিজলে রাজবংশীদের একাধিক

---

(১৩) বেগায়ের, এইচ, এস, জে, সি, সেনসাস রিপোর্ট অব ইন্ডিয়া(রংপুর), ১৮৯১, মেমো নাম্বার-৭০৬-১০, পৃঃ ১-৩

(১৪) ডোনেল, ও, সেনসাস রিপোর্ট অব ইন্ডিয়া,, ১৮৯১, ভল্যুম-৩, পৃঃ ২৬২

(১৫) রিজলে, এইচ, এইচ, দি ট্রাইবস্ এ্যান্ড কাস্টস্ অব বেঙ্গল, ১৮৯১, ভল্যুম-১, পৃঃ ৪৯১, এথনোগ্রাফিক গ্লোসারি, ১৯৮১

স্থানে দোভাষী, মোদাসি(সাম্প্রতিক নাম মদেসিয়া) এবং জালুয়াদের সঙ্গে অভিন্ন বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই মত সর্বাংশে সমর্থনযোগ্য নয়। এই সম্প্রদায়গুলি রাজবংশী সমাজ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভাষা, ধর্ম এবং সংস্কৃতির দিক থেকে রাজবংশীদের সঙ্গে তাদের সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের দিকে লক্ষ্য রেখে রাজবংশী এবং উল্লিখিত এই সব সম্প্রদায়কে অভিন্ন প্রতিপন্ন করা যায় না।

জর্জ আব্রাহম গ্রীয়ারসনের মতে কোচ এবং বোড়ো এই দুটি উপজাতি উৎপত্তিগত দিক থেকে একই নৃগোষ্ঠীর অন্তর্গত। বোড়ো, কোচ এবং মেচ এই তিনটি উপজাতি একটি মূল জাতির বিভিন্ন শাখা মাত্র। কোচ বলতে বোঝায় এক জন হিন্দুকৃত বোড়োকে, যে তারপূর্বতন ধর্ম ত্যাগ করেছে হিন্দু ধর্মের জন্য এবং বোড়ো ভাষাকে ত্যাগ করেছে বাংলা অথবা অসমীয়া ভাষার জন্য। গোয়ালপাড়া, কোচবিহার ইত্যাদি অঞ্চলের রাজবংশীরা এই ধরনের হিন্দুকৃত কোচ।[১৬]

গেটের মতে রাজবংশীরা জাতিতে কোচ এবং এই যুক্তিতেই সিডিউল-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্য। তাঁর রিপোর্ট অনুসারে তীয়র, কৈবর্ত, নমঃশূদ্র এবং অন্যান্য মৎসজীবি সম্প্রদায়ের উপাধিও রাজবংশী। অর্থাৎ তিনি তীয়র, কৈবর্ত, নমঃশূদ্র ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সঙ্গে রাজবংশীদের অভিন্নতার কথাই বলেছেন। কিন্তু ইতোপূর্বে বেভারলীর মন্তব্যে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে নিম্নবঙ্গের রাজবংশীরা উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের থেকে স্বতন্ত্র। উভয় অঞ্চলের রাজবংশীদের দেহাকৃতি, ভাষা, জীবিকা, সংস্কৃতিগত পার্থক্যের কথা বিবেচনা করলে বেভারলীর মতকেই সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয়। নিম্নবঙ্গের রাজবংশীদের ভাষার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের ভাষাগত পার্থক্য যে সুস্পষ্ট একথা ডঃ নির্মল দাশ স্বীকার করেছেন তাঁর 'উত্তরবঙ্গের উপভাষার ঐতিহাসিক গুরুত্ব'(মধুপর্ণী, বালুরঘাট, ১৯৭৭, উত্তরবঙ্গ সংখ্যা) শীর্ষক প্রবন্ধে। নিম্নবঙ্গের রাজবংশীরা মূলতঃ মৎসজীবি। পক্ষান্তরে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীরা কৃষিজীবি। মৎস শিকার এবং বিক্রয় যে তাদের জীবিকা নয় একথা ইতোপূর্বে একবার উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং উত্তর এবং নিম্ন, এই দুই বঙ্গের রাজবংশীরা যে উৎপত্তিগত ভাবে অভিন্ন নয় একথা অবশেষে স্বীকার করতে হয়। তীয়র, কৈবর্ত, জালিয়া, নমঃশূদ্র ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সঙ্গেও দেহলক্ষণ, ভাষা, জীবিকা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাজবংশীদের উল্লিখিত প্রকারের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং গেটের মতের এই অংশ সমর্থনযোগ্য নয়। তিনি দার্জিলিং নেপালের তরাই অঞ্চলের অধিবাসী ধীমল জাতিকেও রাজবংশীরই একটি অংশ বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে পূর্ববঙ্গের অধিবাসী কোচমাণ্ডিরাও উৎপত্তি বিচারে রাজবংশীদের একটি শাখা। দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্য এই টুকু যে কোচমাণ্ডিরা অহিন্দু এবং তারা বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করেনি, অপর পক্ষে রাজবংশীরা হিন্দুকৃত এবং বাংলা ভাষায় অভ্যস্ত। দেখা যাচ্ছে

---

(১৬) গ্রীয়ারসন, জি, এ, লিঙ্গুয়িস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া, ১৯৬৮, ভল্যুম-৩, পার্ট-২ পৃঃ ৯৫, ভল্যুম-৫, পার্ট-১, পৃঃ ১৬৩

গেটের মন্তব্য অনুসারে কোচ এবং রাজবংশী অভিন্ন।[১৭] তাঁর এই বক্তব্য পূর্ববর্তী অনেক গবেষকের মন্তব্যের সমর্থন।

ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া-তে বলা হয়েছে যে কোচরা নিজেদের রাজবংশী বলে পরিচয় দেয়। কিন্তু তাদের এই পরিচয় সত্য নয়। দুটি জাতির উৎপত্তি সম্পূর্ণ পৃথক দুটি উৎস থেকে। কোচ রাজারা মোঙ্গোলীয়া নরগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত, অন্যদিকে রাজবংশীরা দ্রাবিড় নরগোষ্ঠীর বংশধর এবং কোচ রাজ্য প্রতিষ্ঠার আগেই সম্ভবতঃ এই রাজবংশী নামটিকে তারা গ্রহণ করেছে। কোচবিহারের অধিবাসী রাজবংশীরা, দেহাকৃতির দিক থেকে যারা সুস্পষ্ট মোঙ্গোলীয়ান বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, শুধু বিশুদ্ধ কোচ অথবা অন্যান্য কোচদের সঙ্গে অন্য জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত সংকর জাতি বিশেষ, যাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই মোঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য সূচিত হয়েছে।[১৮] এই রিপোর্টেও রাজবংশীদের একটি অংশকে দ্রাবিড় এবং [illegible] আরেকটি অংশকে মোঙ্গোলীয়ান নরগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ধরনের অভিমত ইতোপূর্বে মেগায়ের এবং রিজলের রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে। তবে উল্লিখিত গবেষকদ্বয় কোচ এবং রাজবংশীকে পৃথক জনগোষ্ঠী বলে উল্লেখ করেননি, যা এই রিপোর্টে করা হয়েছে। আর একটি দিক থেকে এই রিপোর্টের স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। পূর্ববর্তী গবেষকদের প্রায় সকলেই রাজবংশীদের কোচবিহার রাজ-পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে অভিমত দিয়েছেন। কিন্তু এই রিপোর্টে কোচবিহার রাজপরিবার এবং রাজ্যের অধিবাসীদের পৃথক পৃথক নরগোষ্ঠীর বংশধর বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই মতের সমর্থন মেলে এইচ, এন, চৌধুরী কৃত 'কোচবিহার স্টেট অ্যান্ড ইট্স ল্যান্ড রেভিনিউ সেটেলমেন্ট' গ্রন্থে প্রকাশিত অভিমতে।[১৯] এই প্রসঙ্গে বিশ শতকের গোড়ার দিকে কোচবিহার রাজপরিবারের প্রতি রাজবংশী সমাজের মনোভাবের কথা উল্লেখ করার মত। রাজানুগ্রহ লাভের আশায় তৎকালে রাজবংশী সমাজের কতিপয় ব্যক্তি কোচবিহার রাজপরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করলেও সাধারণ লোক এই বিষয়ে অনাগ্রহী ছিল। এই অনাগ্রহের ভাব সাম্প্রতিক কালেও বর্তমান। একালে সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়া সত্ত্বেও এই প্রসঙ্গে রাজবংশী সমাজের এই মনোভাব অপসৃত হয়নি। এই বিষয়ে রাজবংশী সমাজের যে স্পষ্ট আপত্তি ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিম্নোদ্ধৃত বাক্যটিতে। বলা হত যে-"উমুরা হইল কোচ আর হামরা হইলোং ক্ষত্রিয়" অর্থাৎ "ওরা কোচ আর আমরা ক্ষত্রিয়"। রাজবংশী সমাজের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীটি আলোচনা সাপেক্ষ। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক রাজবংশী সমাজ বর্তমান

---

(১৭) গেট, ই, এ, সেনসাস রিপোর্ট অব বেঙ্গল, ১৯০১, অ্যাপেনডিক্স-১, পৃঃ ৩৮
(১৮) ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার অব ইন্ডিয়া, ১৯০৮, ভল্যুম-১০, পৃঃ ৩৮৩
(১৯) চৌধুরী, এইচ, এন, কোচবিহার স্টেট অ্যান্ড ইট্স ল্যান্ড রেভিনিউ সেটেলমেন্ট, ১৯০৩, পৃঃ ১২৬

কাজেও কোচবিহার রাজপরিবারের সঙ্গে জাতিগত কোনো সম্পর্ক স্বীকার করেনা। রাজবংশের সঙ্গে বৈবাহিক দিক থেকে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের বংশধরদের পদবী 'দেওয়ান','প্রামানিক' ইত্যাদি সাধারণভাবে রাজবংশীদের পদবী নয়।

ও,ম্যালে রাজবংশীদের বঙ্গুয়া মগদের সঙ্গে এক বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে রাজবংশীরা বাঙালি মাতা ও ব্রহ্মদেশীয় পিতার সন্তান, অথবা আরাকানী মাতা ও বাঙালি পিতার সন্তান।[20] রাজবংশী সমাজের ক্ষত্রিয় সমাজভুক্তির দাবী সম্পর্কে তিনিও অবহিত ছিলেন। রাজবংশীদের প্রথম দাবী কোচ জাতি থেকে পৃথক জাতি হিসেবে তাদের সেনসাস রিপোর্টে অন্তর্ভুক্তকরণ যে মঞ্জুর হয়েছিল ও,ম্যালের রিপোর্টে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁর মত হ'ল এই যে উৎপত্তির দিক থেকে যা-ই হোক না কেন বর্তমানে যে রাজবংশী ও কোচ যে দুটি পৃথক জাতি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং জাতি হিসেবে ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত হওয়ার ক্ষেত্রেও কোনো বাধা নেই।[21] দেখা যাচ্ছে যে উৎপত্তির প্রশ্নটিকে সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়ে, এমনকি কোচ ও রাজবংশীকে পৃথক পৃথক জাতি বলে স্বীকার করে নিয়ে এবং রাজবংশী সমাজের ক্ষত্রিয় সমাজভুক্তির দাবী পর্যন্ত মেনে নিয়ে সেনসাস সুপারিনটেনডেন্ট ও,ম্যালে প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু মূল সমস্যার সমাধান বা প্রশ্নের উত্তর তাঁর রিপোর্টে অনুদ্ঘাটিতই থেকে গিয়েছে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারী রিপোর্টে ডব্লিউ,এইচ,টমসন বলেছেন যে-" রাজবংশীরা উত্তরবঙ্গের স্বদেশীয় অধিবাসী এবং প্রদেশের তৃতীয় বৃহৎ হিন্দু জাতি। ময়মনসিংহ, নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদের কিছু মৎস্যজীবি সম্প্রদায় নিজেদের রাজবংশী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করায় রাজবংশীদের সংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গের কিছু কোচ নিজেদের রাজবংশী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। রাজবংশীদের মধ্যে অনেকে উপবীত ধারণ করেছে এবং ক্ষত্রিয় সমাজভুক্তির দাবীর স্বপক্ষে আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।" দেখা যাচ্ছে যে রাজবংশী সমাজে ক্ষত্রিয়সমাজভুক্তির দাবীকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা টমসনকে ভাবিত করে তুলেছিল। রিপোর্টের অন্যত্র তিনি বলেছেন যে-" এই দাবী বা মনোভাব এমন প্রবল আকার ধারণ করেছিল যে রাজবংশী সমাজকে তাদের দাবীর অনুকূল প্রতিশ্রুতি না দিলে রংপুরে আদমসুমারীর সমস্ত পরিকল্পনাই বাতিল হয়ে যেত।[22] অর্থাৎ ও,ম্যালে এবং টমসন মূল প্রশ্নের মীমাংসা ব্যতিরেকেই তাঁদের মতামত প্রকাশ করেছেন। সুতরাং রাজবংশী জাতির উদ্ভব বিষয়ক আলোচনায় এই দুজনের মতামতের বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই। তবে আলোচ্য

---

(২০) ও,ম্যালে,এল,এস,এস, সেনসাস রিপোর্ট অব ইন্ডিয়া,১৯১১,ভলুম-৫,পার্ট-১,পৃঃ ৩৯৯

(২১) তদেব,পৃঃ ৪৪৫

(২২) টমসন,ডব্লিউ,এইচ, সেনসাস রিপোর্ট অব ইন্ডিয়া,১৯২১,ভলুম-৫,পার্ট-১,পৃঃ ৩৪৩-৩৪৪,৩৪৮

জাতিটির অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কালের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা ও এই সূত্রের মতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ইতোপূর্বে রিজলের মন্তব্যে জানা গিয়েছে যে যেহেতু রাজবংশীদের মধ্যে সকলেই এক গোত্রের অন্তর্ভুক্ত এবং একই গোত্রভুক্ত পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক বিধি লংঘন করেছে তাই তাদের হিন্দুত্ব সংশয়াতীত নয়। কিন্তু এ, ই, পোর্টার-এর মন্তব্যে জানা যাচ্ছে যে রাজবংশীদের মধ্যে কাশ্যপ ছাড়াও শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, গৌতম, শাবর্ণা, কপিল, তাম্বি, বাৎস্য, মৌদ্গল্য, আর্ষ্টি, পরাশর, কৌশিক, বিশ্বামিত্র ইত্যাদি গোত্রেরও সন্ধানও পাওয়া গিয়েছে। তবে তাঁর মতে এই গোত্রগুলির প্রচলন রাজবংশী সমাজে অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে ঘটেছে। প্রধানতঃ তাদের ব্রাত্যসমাজভুক্তির দাবীর ভিত্তি দৃঢ় করার জন্যই রাজবংশী সমাজ এই গোত্রগুলিকে গ্রহণ করে।[23]

পোর্টার তাঁর মন্তব্যের শেষ অংশে রাজবংশীদের কোচ, পলিয়া ইত্যাদি জাতির সঙ্গে অভিন্ন বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে আসাম ও উত্তরবঙ্গবাসী কৈবর্তদের সঙ্গে রাজবংশীদের সাদৃশ্য আছে। উনিশ শতকের প্রথমভাগে রাজবংশী সমাজ ক্ষত্রিয় সমাজভুক্তির যে দাবী তুলেছিল সে সম্পর্কে সেনসাস সুপারিন্-টেণ্ডেণ্ট পোর্টারও অবহিত ছিলেন। তাঁর রিপোর্টে এ সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।[24]

ইংরেজদের উদ্যোগে পরিচালিত ভারতীয় জনতত্ত্ব সম্পর্কিত গবেষণা এবং বিভিন্ন লোকগণনার রিপোর্ট ছাড়াও একাধিক স্থানে রাজবংশী জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। ১২৬১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ফার্সী ইতিহাসগ্রন্থ মিনহাজের 'তবকাত ই নাসিরী'-তে বর্ণিত তুর্কীদের তিব্বত আক্রমণের বৃত্তান্তে জানা যায় যে বখতিয়ার খিলজী ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত আক্রমণ করেন। জে, এ, দাস,-এর মতে এই আক্রমণের সময় ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দ।[25] সে যাই হোক না কেন, এই আক্রমণের বৃত্তান্ত থেকে অবগত হওয়া যায় যে সেই সময় লখনাবতী এবং তিব্বত, এই দুটি রাজ্যের মধ্যবর্তী তুষার পর্বত ও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। সেই জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলে 'কোচ', 'মেচ' এবং 'থারু' এই তিনটি উপজাতি বাস করত।[26]

✓ মিনহাজ এর এই বিবরণের উপরে নির্ভর করে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন-"তুর্কীরা মহম্মদ ইবন বখতিয়ার খিলজীর নেতৃত্বে ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গ(গৌড়) এবং পশ্চিমবঙ্গ(নদীয়া) অধিকার করার পর ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত অধিকারের উদ্দেশ্যে কামরূপ আক্রমণ করে। মিনহাজ-স-সিরাজ রচিত ফারসী ভাষায় ইতিহাসগ্রন্থ, যা তুর্কীদের বঙ্গদেশ অধিকারের কাহিনী বর্ণনা করে(১২৬১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত)অনুসারে কামরূপ'কচ', 'মেজ' এবং 'থারু' (আধুনিক নাম কোংচ বা কোচ, মেচ ও থারু) এই তিনটি উপজাতি দ্বারা অধ্যুষিত ছিল, যাদের মোঙ্গোলীয়ান অবয়ব এবং ভাষা তুর্কীদের মধ্যে স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করেছিল যে সম্ভবতঃ তারা এবং তুর্কীরা একই জাতিভুক্ত। ফারসী

---

(২৩) পোর্টার, এ, ই, সেনসাস রিপোর্ট অব ইন্ডিয়া, ১৯৩১, ভল্যুম-৫, পার্ট-১, পৃঃ ৪৭৪

(২৪) তদেব, পৃঃ ৪৭৩

(২৫) দাস, জে, এ, রংপুর গেজেটিয়ার, ১৯১১, পৃঃ ৮

(২৬) মিনহাজ-স-সিরাজ, তবকাত ই নাসিরী(রেভার্টি অনূদিত), লণ্ডন, ১৮৮১

ইতিহাসগ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে এই সমস্ত উপজাতির দেহাকৃতি এবং গাত্রবর্ণ তুর্কীদের অনুরূপ ছিল। (চোখ বোঁজা, নাক বোঁচা, চোয়ালের হাড় উঁচু এবং গাত্রবর্ণ হলুদের দিকে, যা মোঙ্গোলীয়ান বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক) এবং তারা মূল ভারতীয় ভাষা থেকে স্বতন্ত্র এক ধরনের ভাষায় কথা বলত।[২৭]

আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় অতঃপর মন্তব্য করেছেন-" উত্তরবঙ্গের স্থানীয় অধিবাসীরা বোড়ো নরগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত অথবা মিশ্র অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় ও মোঙ্গোলীয়ান নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের সঙ্গে পরবর্তী কালে নিম্নবঙ্গ(ভাটিদেশী) এবং বিহার থেকে আগত জনপ্রবাহ এসে প্রবেশ করে। তারা বর্তমানে প্রধানতঃ কোচ নামে অভিহিত হতে পারে। এই কোচরা হ'ল হিন্দুকৃত অথবা অর্ধহিন্দুকৃত বোড়ো। তারা তাদের নিজস্ব তিব্বত-ব্রহ্মী ভাষা পরিত্যাগ করে বাংলার উত্তরাঞ্চলে প্রচলিত উপভাষাকে গ্রহণ করেছে,(যার সঙ্গে অসমীয়া ভাষার নিকট সাদৃশ্য বর্তমান) । যখন থেকে তারা হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়েছে, তখন থেকে(প্রধানতঃ বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে) নিজেদের অস্পষ্ট ও মিথ্যা অতীত গৌরবকে অবলম্বন করে নিজেদের রাজবংশী এবং ক্ষত্রিয় বলে দাবী করছে। অথচ একই সময়ে তারা রাজনৈতিক সুবিধা লাভের জন্য হিন্দুসমাজের একেবারে নিম্নতম শ্রেণী তপশিলী বলে পরিচয় দেয়।" [২৮]

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এই অভিমত নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্তের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে উত্তরাঞ্চল সহ সমগ্র বঙ্গদেশ আর্যভাষা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছিল। হিউয়েন সাঙের কামরূপের ভাষাকে মধ্য-ভারতের ভাষা থেকে সামান্য স্বতন্ত্র বলার কারণ হিসেবে তিনি কামরূপের ভাষায় তিব্বত-ব্রহ্মী উপাদানের কথা উল্লেখ করে বলেছেন যে আর্যভাষা কামরূপের উচ্চারণে ঈষৎ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়েছিল।[২৯] এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলে প্রশ্ন থাকে যে তাহলে হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণের ছয়শত বৎসর পরে বখতিয়ার খিলজীর তিব্বত আক্রমণের কালে তিনি অনার্য কোন তিনটি উপজাতির সঙ্গে পরিচিত হন, যাদের ভাষা মূল ভারতীয় ভাষা থেকে স্বতন্ত্র? ছয়শত বৎসরের ব্যবধানে মধ্যভারতের ভাষার সঙ্গে কামরূপের ভাষার পার্থক্য তো আরও অনেক পরিমাণে কমে আসার কথা। দেখা যাচ্ছে যে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রদত্ত এই দুটি বিবৃতি পরস্পরের বিরোধী। কিন্তু যদি বলা যায় যে বখতিয়ার খিলজী মূলতঃ পার্বত্য পথ দিয়েই কামরূপ অভিযানে গিয়েছিলেন বলে সমতলবাসী, আর্যভাষী জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেনি তাহলে একটি বৃত্তান্ত অন্যটির সহগামী এবং পরিপূরক হতে পারে। সুকুমার

---

(২৭) চ্যাটার্জি, সুনীতি কুমার, কিরাত জন কৃতি, ১৯৭৪, পৃঃ ১০০-১০১

(২৮) তদেব, পৃঃ ১১২

(২৯) চ্যাটার্জি, সুনীতি কুমার, দি ওরিজিন অ্যান্ড ডেভলাপমেন্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ, ১৯৭০, ভল্যুম-১, পৃঃ ৭৮-৭৯

দাসের 'উত্তরবঙ্গের ইতিহাস' গ্রন্থে তবকাত ই নাসিরী— এর অনুসরণে বখতিয়ার খিলজির অভিযানপথের যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা এই অনুমানেরই সমর্থক।[30] ফলতঃ পার্বত্য কিছু উপজাতি এবং তাদের ভাষার সঙ্গেই বখতিয়ার খিলজী এবং তাঁর সৈন্য সামন্তদের পরিচয় ঘটেছিল। কামরূপ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে বখতিয়ার খিলজির সমতলবাসীদের সঙ্গে পরিচয় ঘটার সুযোগ ছিল। কিন্তু পরাজিত, সামান্য সংখ্যক অনুচরের সঙ্গে পলায়নপর বখতিয়ার যে স্বাভাবিকভাবেই সে চেষ্টা থেকে বিরত ছিলেন এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। তার পলায়নের পূর্বেও, যখন বখতিয়া খিলজী যখন সৈন্য-সামন্ত সহ কামরূপ থেকে পশ্চাদপসরণ করছিলেন তখন তিনি কামরূপের অধিবাসীদের গণ অসহযোগের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ফলে যে পথ দিয়ে তিনি ফিরছিলেন তার দুই পার্শ্ববর্তী জনপদ জনশূন্য এবং খাদ্যশূন্য এবং পশুখাদ্যশূন্য হয়ে পড়েছিল। সুতরাং সমতলের আর্যভাষী জনসাধারণের সঙ্গে কোনো দিক থেকেই তাঁর পরিচিত হওয়ার সুযোগ ছিল না। অতঃপর একথা বলা যেতে পারে যে তবকাত ই নাসিরী-এর অনুসরণে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাজবংশীদের যে পরিচয় দিয়েছেন তা সমর্থনযোগ্য নয়।

রাজবংশীদের ইতিহাস সম্পর্কে বিভিন্ন পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় তার সঙ্গে ইংরেজ ও দেশীয় গবেষকদের মতামতের সাযুজ্য খুবই কম। বলা চলে যে এই সমস্ত গ্রন্থের প্রতিপাদ্য প্রাগুক্ত সমস্ত গবেষণা কর্মের ফলাফল থেকে স্বতন্ত্র।

ভ্রামরীতন্ত্রে বলা হয়েছে যে মন্দীপুতের ভয়ে ভীত বর্মদের স্ত্রীপুত্র, জাতি ও বন্ধুদের সঙ্গে পৌণ্ড্র দেশ থেকে রত্নপীঠে এসে বসবাস শুরু করে। সেখানে ব্রাহ্মণ অভাবে তারা ক্রমশঃ ক্ষাত্রধর্মচ্যুত হয়। এই স্বধর্ম-চ্যুত ক্ষত্রিয়রাই পরিবর্তিত রাজবংশী নামে খ্যাত।[31]

কালিকা পুরাণে উক্ত হয়েছে যে জামদগ্ন্যের ভয়ে ভীত ক্ষত্রিয়রা ম্লেচ্ছের ছদ্মবেশে ভগবান জল্পীশ দেবের শরণাপন্ন হয় এবং ম্লেচ্ছাচারে অভ্যস্ত হয়ে ম্লেচ্ছ ভাষা ব্যবহার করতে থাকে। তারা গোপনে মহাদেবকে রক্ষা করে তাঁর পূজা করত।[32]

দেখা যাচ্ছে যে কালিকাপুরাণ এবং ভ্রামরীতন্ত্রের মতে কিছুটা অসামঞ্জস্য রয়েছে। ভ্রামরীতন্ত্রের মতে ক্ষত্রিয়রা মন্দীপুতের ভয়ে রত্নপীঠে এসে আশ্রয় নেয়। পক্ষান্তরে কালিকাপুরাণের মতে তারা জামদগ্ন্যের ভয়ে ভীত হয়ে জল্পীশ দেবের শরণ নেয়। এখন দেখা প্রয়োজন যে ভ্রামরীতন্ত্রের মন্দীপুত এবং কালিকা-পুরাণের জামদগ্ন্য একই না পৃথক পৃথক ব্যক্তি।

---

(৩০)দাস সুকুমার, উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, পৃ ১৯৮২, পৃঃ ১০৬-১০৫
(৩১)ভ্রামরীতন্ত্র, ২য় পটল
(৩২) কালিকাপুরাণ, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৪বঙ্গাব্দ, অষ্টাশীতিতমোধ্যায়

এমন অনুমান অসঙ্গত নয় যে জামদগ্ন্য পরশুরাম ত্রেতাযুগের ক্ষত্রিয় নিধনকারী বলে প্রসিদ্ধি থাকায়, ঐতিহাসিক পুরুষ নন্দীসুত মহাপদ্মনন্দের সঙ্গে তাঁর চারিত্রিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করে মহাপদ্মনন্দকেই পরশুরাম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আসলে কালিকাপুরাণোক্ত পরশুরাম এবং ব্রাহ্মণীতন্ত্রোক্ত নন্দীসুত একই ব্যক্তি। এই অনুমানের সমর্থনে বিষ্ণুপুরাণের কিছু অংশ উদ্ধারযোগ্যঃ-

মহানন্দীসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধ মহাপদ্মনন্দঃ
পরশুরাম ইবাপরোঽখিল ক্ষত্রান্তকারী ভবিতা।।৪।।
ততঃ প্রভৃতি শূদ্রাঃ ভূমিপালা ভবিষ্যন্তি।[৩৩]

অর্থাৎ মহানন্দীর ঔরসে শূদ্রানীর গর্ভে অতিলোভী মহাপদ্মনন্দের জন্ম হবে। এই মহাপদ্মনন্দ পরশুরামের মত ক্ষত্রিয় নিধন করবে এবং তখন থেকে শূদ্রই ভূমিপালক বা রাজা হবে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও অনুরূপ উক্তি করা হয়েছে। বলা হয়েছে "মহানন্দীর ঔরসে, শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভে ক্ষত্রিয় বিনাশকারী রাজা মহাপদ্মনন্দের জন্ম হবে। সেই রাজা শূদ্রের ন্যায় অধার্মিক হবে এবং পরশুরামের মত ক্ষত্রিয় নিধন করে পৃথিবীর একচ্ছত্র শাসক পরিণত হবে।"[৩৪]

এই প্রসঙ্গে পুরাণ এবং তন্ত্রগ্রন্থগুলিতে অনুসৃত সাধারণ বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া দরকার। সেখানে সাধারণতঃ একজন ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ঋষি এবং এক বা একাধিক শ্রোতা থাকেন। এই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ঋষি সম্মুখবর্তী শ্রোতাকে উদ্দেশ্য করে কিছু ভবিষ্যৎবাণী করেন। বলাই বাহুল্য, এই ভবিষ্যৎবাণীগুলি, ভবিষ্যৎবাণীতে উক্ত ঘটনাগুলির বিবরণমাত্র। আসলে এইসব ঘটনা পূর্বেই সংঘটিত হয়েছে। ফলতঃ অনেক সময় দেখা যায় যে সর্বদ্রষ্টা ঋষির ভবিষ্যৎবাণীর সঙ্গে ঘটনা মিলে যাচ্ছে। আঙ্গিকের এই বিশেষ কৌশলই হ'ল পুরাণ এবং তন্ত্রসমূহের খ্যাতি এবং জনপ্রিয়তার মূল চাবিকাঠি। এইভাবে সর্বদ্রষ্টা ঋষির জবানীতে সংঘটিত ঘটনা বর্ণনা করার সময়ে পুরাণ এবং তন্ত্রকারেরা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি এবং আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হতেন। ফলে একই ঘটনার বিবরণ বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন রকমের হত। যেমন- কালিকাপুরাণের জামদগ্ন্য ব্রাহ্মণীতন্ত্রে হয়েছেন নন্দীসুত। সুতরাং কালিকাপুরাণোক্ত পরশুরাম এবং ব্রাহ্মণীতন্ত্রোক্ত নন্দীসুত যে একই ব্যক্তি এ বিষয়ে মোটামুটিভাবে নিঃসংশয়িত হওয়া চলে। অতঃপর প্রশ্ন ওঠে যে ব্রাহ্মণীতন্ত্রোক্ত রত্নপীঠ এবং কালিকাপুরাণোক্ত জল্পীশ দেবের অবস্থানভূমি কি এক?

কালিকাপুরাণে বলা হয়েছে যে কামরূপের বায়ুকোণে অবস্থিত জল্পীশ নামে একটি স্থানে ত্রিপুরারি

---

(৩৩) বিষ্ণুপুরাণ, বরদা ও বসাক প্রকাশিত ১২৭৫ বঙ্গাব্দ, চতুর্থাংশ, চতুর্বিংশতি অধ্যায়

(৩৪) শ্রীমদ্ভাগবত, দ্বাদশ স্কন্ধ, ১ম অধ্যায়

91206
8 OCT 1985
NORTH BENGAL
UNIVERSITY LIBRARY
RAJA RAMMOHUNPUR

মহাদেব আপনার অতুলনীয় লীলা প্রদর্শন করেন। সেখানে হিমালয় থেকে নিঃসৃত পুতপ্রবাহী নদী জটোদ্ভবা প্রবাহিত। সেই নদীতে স্নান করলে গঙ্গাস্নানের তুল্য পুণ্য লাভ হয়।[35] কালিকাপুরাণোক্ত এই জল্পীশ বর্তমানে জল্পেশ নামে পরিচিত এবং তা জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানা সদরের চার মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। পুরাণোক্ত জটোদ্ভবা নদী 'জর্দা' নামে পরিচিত হয়ে বর্তমানে জল্পীশ বা জল্পেশ দেবের মন্দিরের পশ্চিম দিয়ে প্রবাহিত।

মার্টিনের গ্রন্থে বুকাননের প্রদত্ত রিপোর্ট অনুসারে কামরূপ 'কামপীঠ', 'যোনিপীঠ', 'মনিপীঠ' এবং 'রত্নপীঠ', এই চারটি পীঠ বা অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। এবং রাজ্যের সর্বপশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ছিল রত্নপীঠ।[36] খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদের বক্তব্যও এই তথ্যকে সমর্থন করে।[37] যোগিনীতন্ত্রেও এই তথ্যের সমর্থন মেলে।[38] সুতরাং প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত রত্নপীঠেই যে জল্পীশ দেবের অবস্থানভূমি এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে অতঃপর কোনো বাধা থাকে না।

এর পরে যে প্রশ্নটির মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন তা হ'ল এই যে ব্রামরীতন্ত্রোক্ত পৌণ্ড্রদেশ কোথায় অবস্থিত ছিল। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে দু'টি পৌণ্ড্রদেশের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।[39] অনুমান করা যেতে পারে যে এই দুটি পৌণ্ড্রদেশের একটি দক্ষিণভারতে কেরল প্রদেশের কাছাকাছি এবং অপরটি ভারতের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ছিল। আমাদের আলোচ্য ভারতের পূর্ব প্রান্তস্থ পৌণ্ড্রদেশ। মহাভারত বর্ণিত ভারতের ১৫৪ টি প্রদেশের মধ্যে পৌণ্ড্র নামে একটি রাজ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।[40] ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলা হয়েছে যে পৌণ্ড্রদেশ ভারতের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ছিল।[41] ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন -" পৌণ্ড্র একটি জাতির নাম। ইহারা উত্তরবঙ্গে বসবাস করিত বলিয়া এই অঞ্চল পুণ্ড্রদেশ ও পুণ্ড্রবর্ধন নামে খ্যাত ছিল।---পুণ্ড্রদেশের রাজধানীর নামও ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। প্রাচীনকালে ইহা একটি প্রসিদ্ধ নগরী ছিল। বগুড়ার সাত মাইল দূরে অবস্থিত মহাস্থানগড়ই প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। কারণ মৌর্যযুগের একখানি শিলালিপিতে এই স্থানটি পুণ্ড্রনগরী বলিয়া উল্লিখিত ---।[42] মনুসংহিতায়

---

(৩৫) কালিকাপুরাণম্, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

(৩৬) মার্টিন, এম, দি হিস্ট্রি, অ্যান্টিকুইটি, টোপোগ্রাফি অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স অব ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া, লণ্ডন ১৮৩৮, ভল্যুম -৩, পৃঃ ৪০৪

(৩৭) খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ, কোচবিহারের ইতিহাস, ১৯৩৬, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩ - ৪

(৩৮) যোগিনীতন্ত্র, একাদশ পটল

(৩৯) বাল্মীকি রামায়ণ, উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

(৪০) মহাভারত (বেদব্যাসকৃত), কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত অনুবাদ, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, কলকাতা, ১৯৯০, সভাপর্ব, একোনপঞ্চাশোধ্যায়

(৪১) ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, ৫৭ ও ৫৮ সংখ্যক শ্লোক

(৪২) মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাংলাদেশের ইতিহাস, ১৯৭৪, প্রথম খণ্ড (প্রাচীন যুগ), পৃঃ ৭

বলা হয়েছে যে পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রাবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীনা, কিরাত, দরদ, খশ ইত্যাদি ক্ষত্রিয়রা উপনয়নাদি সংস্কারের অভাবে এবং ব্রাহ্মণের অদর্শনে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।[৪৩] মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের ৪৩ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় কুল্লুক মন্তব্য করেছেন যে ক্ষত্রিয়রা, যারা পৌণ্ড্রদেশে বাস করত, বৈদিক আচার অনুষ্ঠান ত্যাগ করে এবং শূদ্রে পরিণত হয়। মনুসংহিতার বিধান অনুযায়ী বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যরা যে কোনো কারণেই হোক, বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধান লংঘন করলে ব্রাত্য পদবাচ্য।[৪৪]

সুতরাং যোগিনী তন্ত্র এবং কালিকাপুরাণোক্ত পরস্পরবিরোধী তথ্য সমূহকে সহযোগী সূত্রের সাহায্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে উপস্থাপিত করলে বিষয়টি এই রকম দাঁড়ায় যে- যোগিনীতন্ত্রের বর্ণিত এবং কালিকা-পুরাণের জামদগ্ন্য একই ব্যক্তি- ঐতিহাসিক পুরুষ রাজা মহাপদ্মনন্দ। যোগিনীতন্ত্রের রত্নপীঠ এবং কালিকা-পুরাণের ললিত দেশের অবস্থিতি একই ভূখণ্ড। পৌণ্ড্রদেশ থেকে রাজা মহাপদ্মনন্দের ভয়ে ভীত কিছু সংখ্যক পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় করতোয়া নদী অতিক্রম করে রত্নপীঠ বা ললিত দেশের অবস্থান ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ব্রাহ্মণের অভাব বা অদর্শন জনিত কারণে বৈদিক আচার অনুষ্ঠানে বিরত থেকে ম্লেচ্ছ সংস্পর্শে ক্রমশঃ ম্লেচ্ছে পরিণত হয় ও ম্লেচ্ছতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। রত্নপীঠে এসে সংখ্যালঘু পৌণ্ড্রজাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ স্থানীয় অধিবাসীদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে এবং তাদের পূর্বতন ধর্মীয় আচার, ভাষা এবং সংস্কৃতিকে ভুলে যাবে এমন অনুমান অসংগত নয়।

এবিষয়ে অম্বিকাচরণ সরকার মহাশয়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন-"মোঙ্গলীয় শ্রেণীর অতি প্রভাবশালী বোড়ো গোষ্ঠীর লোকদের সংস্পর্শে এসে তৎকালীন দুর্বল রাজবংশী(পৌণ্ড্র ?) জাতি নিজেদের ভাষা হারিয়ে ফেলেন। যদিও বহু বছর পরেও তাদের ভাষা ও সামাজিক রীতি কিছু পরিমাণে রয়ে গেছে।"[৪৫]

অনুরূপ মন্তব্য করেছেন 'দি রাজবংশীজ অব নর্থ বেঙ্গল' গ্রন্থের লেখক ডাঃ চারুচন্দ্র সান্যাল। তাঁর মতে-"কিছু পৌণ্ড্রদেশবাসী পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় (উত্তরাঞ্চলীয় রাজবংশী) করতোয়া অতিক্রম করে কামরূপে এসে উপনিবিষ্ট হয়েছে। এই ক্ষত্রিয়রা 'ব্রাত্য ক্ষত্রিয়', 'বহিষ্কৃত ক্ষত্রিয়' বা 'শূদ্র পরিণত ক্ষত্রিয়' হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেওয়ার দাবী করতে পারে।"[৪৬]

'রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস' গ্রন্থের লেখক উপেন্দ্রনাথ বর্মনও এই মর্মে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন।[৪৭]

---

(৪৩) মনুসংহিতা, ১০ম অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা - ৪৩, ৪৪
(৪৪) কুল্লুক কৃত মনুসংহিতার ৪৩ ও ৪৪ সংখ্যক শ্লোকের টীকা
(৪৫) সরকার অম্বিকাচরণ, কোচ-রাজবংশী জাতির ইতিহাস আরু সংস্কৃতি, বোঙাইগাঁও, ১৯৮৯, পৃঃ ১১
(৪৬) সান্যাল চারুচন্দ্র, দি রাজবংশীজ অব নর্থ বেঙ্গল, ১৯৬৫, পৃঃ ১১
(৪৭) বর্মন উপেন্দ্রনাথ, রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩-১১

বিভিন্ন মত ও বক্তব্যের পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক রাজবংশী সমাজের উদ্ভব বিষয়ে দেশীয় এবং বিদেশী গবেষকবৃন্দ কোনো একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। এই মতপার্থক্যের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সম্পর্কে চারটি সুস্পষ্ট অভিমত সৃষ্টি হয়েছে। গবেষকদের একটি অংশের মতে রাজবংশীরা মোঙ্গোলীয়ান নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। একটি অংশের মতে তারা দ্রাবিড় নরগোষ্ঠী ভুক্ত। কারও কারও মতে উল্লিখিত জাতিটি মিশ্র অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় এবং মোঙ্গোলীয়ান নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উদ্ভূত। অন্যদিকে পুরাণ, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে উপস্থাপিত করে যে মতটির সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে সেই মত অনুসারে ক্ষত্রিয় বিদ্বেষী রাজা মহাপদ্মনন্দের অত্যাচারে বিতাড়িত পৌণ্ড্রদেশবাসী ক্ষত্রিয় সমাজের একটি অংশ উত্তরবঙ্গে এসে উপনিবিষ্ট হয়। বর্তমান রাজবংশী জাতি সেই লুপ্তপরিচয় পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়দের উত্তরপুরুষ।

এই চারটি মতের মধ্যে এককভাবে কোনোটিই গ্রহণযোগ্য নয়। মতগুলির মধ্যে প্রথম দুটি গ্রহণযোগ্য নয় এই কারণেই যে কোনো একটি জাতি অবিমিশ্রভাবে একটি নির্দিষ্ট জাতির বংশধর, একথা বলা যায় না। ইতিহাসের নিজস্ব নিয়মেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ইত্যাদি সংঘটিত হয়। উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে একাধিক জনপ্রবাহ বয়ে গিয়েছে। কিন্তু এইসব জনপ্রবাহের সবগুলিই যে উত্তরবঙ্গের মাটি থেকে নিঃশেষে মুছে গিয়েছে তা নয়। বরং বলা যায় যে এক একটি জনপ্রবাহ এই অঞ্চলে কিছুকাল অবস্থান করে, ইতিহাসের প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ার পরে স্থানান্তরে যাওয়ার সময় এখানকার মাটিতে, জনগঠনে, সংস্কৃতিতে কিছু না কিছু অবশেষ রেখে গিয়েছে। এই অবশিষ্ট অংশই পরবর্তী জনপ্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এখানকার মাটিতে তৈরী করেছে একটি সমন্বিত জন। এই সমন্বিত জনই হ'ল উত্তরবঙ্গের বর্তমান অধিবাসী রাজবংশী সমাজ। মোঙ্গোলীয়ান নরগোষ্ঠীর প্রবেশের পূর্বে এই অঞ্চল নিশ্চয়ই জনহীন ছিল না। অন্ততঃ এই অঞ্চলের বাসযোগ্য সমতল-ভূমিতে তখন কোনো না কোনো জাতি বা উপজাতির দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। সেক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট মোঙ্গোলীয়ান জাতির লোকদের সঙ্গে তাদের কোনো না কোনো প্রকারে সংমিশ্রণ ঘটেছে। কারণ একই ভূখণ্ডের অধিবাসী দুটি জনগোষ্ঠী কখনোই দীর্ঘকাল এক সঙ্গে বসবাস করা সত্ত্বেও তাদের পরস্পর নিজেদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখতে পারেনা। অবশ্য একেবারেই যে পারে না এমন কথাও বলা যায় না। পারে। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হ'ল উত্তরবঙ্গের একটি আদিম উপজাতি 'টোটো' উপজাতি। এই উপজাতিটি বিশ শতকের এই সময়েও প্রতিবেশী জনগোষ্ঠী এবং বহির্জগতের প্রভাব থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্য বজায়ের যে চেষ্টা, তার ফল টোটোদের পক্ষে শুভ হয়নি। এর প্রমাণ হ'ল টোটোদের বর্তমান অবস্থা। বর্তমানে টোটো উপজাতির সমস্ত সংখ্যা অবিশ্বাস্য রকমের একটি ছোট

থেকে এসে চেপেছে। বলা যেতে পারে যে টোটো উপজাতির এই রক্ষণশীলতা যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে হয়তো টোটোরা কিছুদিনের মধ্যে অবলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু রাজবংশীরা আর্য ধর্ম, ভাষা এবং সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে একটি বিকাশশীল, ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠিতে পরিণত হয়েছে। ফলতঃ এমন অনুমানই সঙ্গত যে বর্তমান রাজবংশী সমাজ যে জাতিরই উত্তরপুরুষ হোক না কেন, তারা আদিম অবস্থা থেকেই প্রতিবেশী অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় ভিন্ন অপেক্ষাকৃত গ্রহণশীল এবং উদার মনোভাবাপন্ন। যদি তা না হত তাহলে তাদের সম্ভাব্য পরিণতি হত টোটো উপজাতির মত। প্রথম পর্বের ঐতিহাসিক প্রবাহের মূল রাজবংশী সমাজে আদিম অবস্থা থেকেই কার্যকরী হয়েছিল বলেই আর্য ভাষা এবং সংস্কৃতিকে তারা গ্রহণ করতে পেরেছে এবং ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে বহু জনপ্রবাহ এবং তাদের সংস্কৃতিকে ধারণ করে রাজবংশী জনের গঠন সম্পূর্ণ হতে পেরেছে।

উল্লিখিত যুক্তির ভিত্তিতে রাজবংশীদের উদ্ভব বিষয়ক তৃতীয় মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। রাজবংশী সমাজ ক্ষত্রিয় কি না তা প্রমাণ করা এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। কারণ বর্তমান সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি বিভাগ নিরর্থক। তাছাড়া অন্য জাতির সঙ্গে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেনি এমন সভ্য জাতিও (জাতি শব্দটি এখানে জনগোষ্ঠীর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে) ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ নেই। সুতরাং রাজবংশী সমাজের গঠনে কী কী উপাদান রয়েছে তা খতিয়ে দেখার জন্য অতঃপর সংশ্লিষ্ট জাতিটির উদ্ভব বিষয়ক চতুর্থ মতটিকে তৃতীয় মতটির পরিপূরক মত হিসেবে গ্রহণ করে নিম্নরূপ তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে গৃহীত মত যুক্তির যাথার্থ্য প্রতিপাদনের চেষ্টা করা হচ্ছে।

আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে দ্রাবিড়দের আগমনের পূর্বে কেন্দ্রীয় উত্তরবঙ্গ (পৌণ্ড্রদেশ) মোন-খের নামক একটি জাতির লোকদের দ্বারা অধ্যুষিত ছিল। তিব্বত-চীনা জাতির লোকেরা তখনও উত্তরবঙ্গে আসেনি। সেই সময়ে বঙ্গ এবং কলিঙ্গ থেকে দ্রাবিড়রা ক্রমশঃ কেন্দ্রীয় উত্তরবঙ্গে এসে বসবাস শুরু করে। এবং কালক্রমে সেখানকার শাসক শ্রেণীতে পরিণত হয় এই দ্রাবিড়রাই পরবর্তী কালে নিজেদের আর্যের বংশোদ্ভূত বলে দাবী করতে থাকে।[৪৮] অনুমান করা যেতে পারে যে এই দ্রাবিড়রাই হ'ল পুরাণ এবং তন্ত্রোক্ত পৌণ্ড্রক ক্ষত্রিয়। এখানে ঐতিহাসিক একটি ঘটনার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। সম্ভবতঃ পৌণ্ড্রদেশে উপনিবিষ্ট দ্রাবিড়রা শাসক শ্রেণীতে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে পূর্বতন অধিবাসী মোন-খেরদের শূদ্র আখ্যা দিয়ে তাদের উপরে সামাজিক শোষণ এবং অত্যাচার চালাতে থাকে। ফলতঃ প্রথমদিকে মোন-খেরদের উপরে আধিপত্য বিস্তারে সফল হলেও অত্যাচারিত এবং শোষিত মোন-খের জাতি ক্রমশঃ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আর এই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন খুব সম্ভব নক্ষ নামে কোনো একজন সামন্ত রাজা, যিনি সম্ভবতঃ মোন-খের গোষ্ঠীরই লোক ছিলেন। পুরাণ এবং তন্ত্রগুলিতে যে নক্ষ

---

(৪৮) চ্যাটার্জি সুনীতি কুমার, দি ওরিজিন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অব দি বেঙ্গালী ল্যাংগুয়েজ, ১৯৭৫ ভলুম-১, পৃঃ ৬৮-৬৯

বা মহাপদ্মনন্দের কথা বলা হয়েছে এই বিদ্রোহের নায়ক নন্দ বা মহাপদ্মনন্দ এবং তিনি একই ব্যক্তি নাও হতে পারেন। জামদগ্ন্য পরশুরামের সঙ্গে চারিত্রিক সাদৃশ্য বশতঃ মহাপদ্মনন্দ যেমন পুরাণ এবং ভাষ্যকারদের দ্বারা পরশুরাম বলে অভিহিত হতে পারেন তেমনি ভাবে পৌণ্ড্র দেশের গণবিদ্রোহের নায়ক নন্দ সম্ভবতঃ মহাপদ্মনন্দের সঙ্গে চারিত্রিক সাদৃশ্য বশতঃ মহাপদ্মনন্দ বলে আখ্যাত হয়েছেন। অথবা ঐতিহাসিক পুরুষ মহাপদ্মনন্দ এবং গণবিদ্রোহের নায়ক নন্দ একই ব্যক্তিও হতে পারেন। সে যাই হোক না কেন, পৌণ্ড্র দেশে এই গণবিদ্রোহ দেখা দিলে সেখানকার আর্য বলে পরিচিত দ্রাবিড় বা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা বিদ্রোহ দমনে অক্ষম হয়ে রাষ্ট্রচ্যুত, অধুনা উত্তরবঙ্গে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই রাষ্ট্রবিপ্লব এবং দ্রাবিড় বা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়দের পৌণ্ড্রদেশ থেকে পলায়ন এবং উত্তরবঙ্গে তাদের আশ্রয়-গ্রহণ ইত্যাদি ঘটনার সংঘটনকাল এবং মহাপদ্মনন্দের রাজত্বকালের মধ্যে যদি কোনো সম্পর্ক থাকে তাহলে বলতে হয় যে উত্তরবঙ্গে দ্রাবিড়দের প্রবেশের সময়সীমা হ'ল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগ। প্রচলিত ইতিহাসে রাজা মহাপদ্মনন্দের রাজত্বকাল হ'ল ৩৬৮ থেকে ৩৩৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। এই সময়-সীমার দিকে লক্ষ্য রেখেই দ্রাবিড়দের উত্তরবঙ্গে প্রবেশের এই সম্ভাব্য সময় নির্দেশ করা হ'ল।

আমাদের গৃহীত মত অনুসারে রাজবংশীরা দ্রাবিড় এবং মোঙ্গোল এই দুই নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উদ্ভূত এবং অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে, বাংলাদেশে যখন আর্যীকরণ শুরু হয় এবং রাজবংশীদের পূর্বপুরুষরা এই আর্যীকরণের আওতায় আসে তখন তাদের সঙ্গে আর্যরক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে। উপরের আলোচনায় উত্তরবঙ্গে দ্রাবিড়দের প্রবেশের কাল সম্পর্কে একটি আপাতস্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গিয়েছে। অতঃপর মোঙ্গোলীয়ান নরগোষ্ঠীর উত্তরবঙ্গে প্রবেশের সময় সম্পর্কিত প্রশ্নটির মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেছেন যে যদিও আসাম এবং উত্তরপূর্ববঙ্গে তিব্বত-চীনা গোষ্ঠীর অন্তর্গত বোড়ো বংশোদ্ভূত তিব্বত-ব্রহ্মীদের আগমনের সঠিক সময়সীমা জানা যায় নি, তবু বলা যেতে পারে যে খ্রীষ্টজন্মের কিছু পূর্বে তারা আসাম এবং পূর্ববঙ্গে প্রবেশ করে ও সেখান থেকে ক্রমশঃ উত্তরবঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে।[৪৯] এ বিষয়ে যেহেতু অন্য কোনো প্রামাণ্য তথ্যের উল্লেখ আর কোথাও পাওয়া যায় না, তাই আলোচ্য বিষয়টির মীমাংসায় এই মতটিকে সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণের পক্ষে কোনো বাধা নেই।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে উত্তরবঙ্গের মাটিতে প্রথমে দ্রাবিড় এবং পরে মোঙ্গোল নরগোষ্ঠীর লোকেরা এসে উপনিবিষ্ট হয়। এই নরগোষ্ঠীর মধ্যে প্রথমোক্তটির প্রায় তিনশত বৎসর পরে দ্বিতীয়টি উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে। সুতরাং এই প্রত্যাশাই স্বাভাবিক যে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকেরা মোঙ্গোলীয়ানদের উপরে প্রভাব

---

(৪৯) তদেব, পৃঃ ৬৯-৭০

বিস্তার করে শাসক শ্রেণীতে পরিণত হবে। কিন্তু কার্যতঃ তা হয়নি। বরং দেখা গিয়েছে যে কি জনগঠনে, কি সংস্কৃতিতে, কি রাজনৈতিক আধিপত্যে, সর্বত্র মোঙ্গোলীয়ানরা দ্রাবিড়দের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রাক্‌মুসলীম যুগে বাংলাদেশে দশম শতাব্দীতে মোঙ্গো শাখার অন্তর্ভুক্ত কম্বোজ বা কোচরা বাংলা-দেশের উত্তরাংশে তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়। উত্তরবঙ্গে এবং আসামের পশ্চিম অংশে বিশ শতকের প্রথমার্ধেও মোঙ্গোলীয়ান গোষ্ঠীভুক্ত কোচ রাজারা রাজত্ব করতেন। সর্বক্ষেত্রে মোঙ্গো-লীয়ানদের এই প্রাধান্যের কারণ হ'ল এই যে তারা দ্রাবিড়দের তুলনায় সংখ্যায় অধিক ছিল। পক্ষান্তরে পৌণ্ড্রদেশ থেকে বিতাড়িত দ্রাবিড়রা সংখ্যায় ছিল অনেক কম। অনুমান করা যেতে পারে যে পৌণ্ড্রদেশের রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি কারণে কম সংখ্যক দ্রাবিড় বা পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়কেই দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। সে যাই হোক না কেন এই দ্রাবিড়রা পৌণ্ড্রদেশে সাময়িকভাবে মোন-খের জাতির উপরে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হলেও বিতাড়িত হয়ে উত্তরবঙ্গে এসে সংখ্যা গরিষ্ঠ মোঙ্গোলীয়ানদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে যে দ্রাবিড়রা কি মোঙ্গোলীয়ানদের আধিপত্য বিস্তারে বাধা দেয়নি, এবং এই বাধা দানের ফলশ্রুতিতে কি দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে কোনো সংঘর্ষ হয়নি? হওয়াই স্বাভাবিক, এবং সম্ভবতঃ তা হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাস এ ব্যাপারে একেবারে নীরব। সুতরাং আমাদের অনুমান করতে হয় যে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগে দ্রাবিড় এবং তার অন্ততঃ তিনশত বৎসর পরে মোঙ্গোলীয়ান কুশাণরা লোকেরা উত্তরবঙ্গে উপনিবিষ্ট হয়। প্রাথমিক ভাবে দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের পরে সমঝোতার সূত্রপাত ঘটে এবং এই সমঝোতার সুদূর প্রসারী ফলশ্রুতি পরবর্তীকালে সহাবস্থানসূত্রে বসবাসকারী দুটি গোষ্ঠী একটি অখণ্ড মানবগোষ্ঠীতে পরিণত হয়, যার বর্তমান নাম রাজবংশী। আমরা ইতোপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে বঙ্গদেশে আর্যীকরণ যখন শুরু হয় তখন রাজবংশীদের পূর্বপুরুষরা সেই আর্যীকরণের বাইরে ছিল না। কারণ এই আর্যীকরণের ঢেউ উত্তরবঙ্গকেও প্লাবিত করেছিল। সুতরাং অতঃপর আমরা অনুমান করি যে সেই সময়ে রাজবংশী সমাজের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে আর্যদের রক্তগত সংমিশ্রণ, অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণে হলেও সংঘটিত হয়েছিল। সাম্প্রতিক রাজবংশী সমাজ যে দ্রাবিড়, মোঙ্গোলীয়ান এবং আর্য এই তিন বৈশিষ্ট্যের, অর্থাৎ মিশ্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তার প্রমাণ মেলে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে। এই জাতিটি যে শুধু মোঙ্গোলীয়ান বা শুধু দ্রাবিড় বংশোদ্ভূত নয় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে তাদের শরীরের গঠন এবং গাত্রবর্ণের মধ্যে। উত্তরবঙ্গের মোঙ্গোলীয়ান নরগোষ্ঠীর একটি অবিমিশ্র শাখা হ'ল মেচ উপজাতি। তাদের শারীরিক গঠন এবং গাত্রবর্ণই তার সবচাইতে বড় প্রমাণ। মেচদের সকলেই পীতাভ গাত্রচর্মের অধিকারী। পক্ষান্তরে রাজবংশীদের মধ্যে পীতাভ গাত্রচর্মের অধিকারী যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে কৃষ্ণবর্ণের গাত্রচর্মের অধিকারীরাও। তবুও বলা যেতে পারে যে রাজবংশীদের দেহের অন্যান্য

---

(৫০) চন্দ রমাপ্রসাদ, গৌড় রাজমালা, রাজশাহী, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৩৭

লক্ষণের বিচারে তাদের মধ্যে মোঙ্গোলীয়ান বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্যই সূচিত হয়। ঈষৎ বক্র চক্ষু, শক্ত চোয়াল, প্রায় শ্মশ্রু গুম্ফবিহীন মুখমণ্ডল, উচ্চতার তুলনায় বিস্তারের প্রাধান্যই হ'ল রাজবংশীদের শারীরিক সংস্থানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে প্রাক্তনরা পৌন্ড্রদেশে শাসকশ্রেণীতে রূপান্তরিত হওয়ার পরে নিজেদের আর্যবংশোদ্ভূত বলে পরিচয় দিয়েছিল। পরবর্তীকালে মোঙ্গোলীয়ান জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে তারা তাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সত্তাকে বিলীন করে দিলেও সম্ভবতঃ জাতিগত গৌরবের একটি বোধ তাদের মধ্যে বীজ আকারে নিহিত ছিল। এই বোধই সম্ভবতঃ দীর্ঘদিন পরে, উনিশ শতকের মধ্যভাগে একটি আন্দোলনের আকারে দানা বাঁধতে থাকে এবং সমগ্র রাজবংশী সমাজকে ক্ষত্রিয় সমাজভুক্তির আন্দোলনে অনুপ্রাণিত করে। অবশ্য রাজবংশী সমাজের ক্ষত্রিয় সমাজভুক্তির আন্দোলনের এটিই একমাত্র ঐতিহাসিক কারণ নাও হতে পারে। বাংলাদেশে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকেই আর্যীকরণ শুরু হয় এবং গুপ্ত শাসনকালে, অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীতে তা মোটামুটি সম্পূর্ণ হয়।[৫১] কিন্তু বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চলে এই আর্যীকরণ একই সঙ্গে শুরু হয়ে একই সঙ্গে শেষ হয়েছিল এমন বলা বোধহয় সঙ্গত নয়। গ্রহণ-বর্জন পরম্পরার মধ্য দিয়ে এই আর্যীকরণের ধারা পরবর্তী শতাব্দীগুলি পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে এমন অনুমানই বোধহয় সঙ্গত। বিশেষতঃ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি সম্পর্কে একথা আরও বেশী করে বলা চলে। উত্তরবঙ্গ ভৌগোলিক বিচারে এই ধরনের একটি অঞ্চল বলে পরিগণিত। সুতরাং এমন অনুমান করা যেতে পারে যে এখানকার অধিবাসী রাজবংশী সমাজে আর্যীকরণ অপেক্ষাকৃত ধীর গতিতে সম্পন্ন হয়েছে বলে আর্যীকরণের এই ধারা এখানে উনিশ শতক পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। তবে, সরকারী নথিপত্রে যখনই ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন জাতি হিসেবে চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে তখনই সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে আর্যীকৃত রাজবংশী সমাজ নিজেদের আর্যত্বের দাবী নিয়ে আন্দোলন শুরু [illegible] করেছে। উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথমভাগে এই আন্দোলন যে তীব্র আকার ধারণ করেছিল তা তৎকালীন একাধিক জনগণনা আধিকারিকের প্রদত্ত রিপোর্টের পর্যালোচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে নেতৃত্ব দেন কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা মহকুমার অন্তর্গত খলিসামারী গ্রামের অধিবাসী পঞ্চানন বর্মা। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের জনগণনা আধিকারিকের নিকট যথাসময়ে ক্ষত্রিয় সমাজভুক্তির দাবী পেশ করার উদ্দেশ্যে পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে তারিখে রংপুরে একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।। এই অধিবেশনে সমাগত আসাম এবং উত্তরবঙ্গের চারশত প্রতিনিধি একটি দাবীপত্র রচনা করেন। এই দাবীপত্রের মূল কথা ছিল এই যে রাজবংশী এবং কোচকে

---

(৫১) চ্যাটার্জি, সুনীতি কুমার, দি ওরিজিন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ, ১৯৭০, ভল্যুম-১, পৃঃ ৭৯-৮১

সেনসাস রিপোর্টে পৃথক পৃথক ভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং রাজবংশীকে ক্ষত্রিয় হিসেবে গণনা করতে হবে। উল্লেখ্য যে এই সেনসাসে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তবে রিপোর্টে তাদের ক্ষত্রিয় বলে ধরা হয়েছিল। ইতোপূর্বে রংপুর ক্ষত্রিয় সমিতি তৎকালীন জনগণনা আধিকারিকের নির্দেশক্রমে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা প্রস্তুত একটি ব্যবস্থাপত্র তাঁর কাছে প্রেরণ করেছিল। উক্ত ব্যবস্থাপত্রে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করে পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁদের অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। রিপোর্টে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় হিসেবে উল্লেখ এই অনুমোদনেরই ফলশ্রুতি। এর পর ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ এবং ২৯ মে তারিখে অনুষ্ঠিত রংপুর ক্ষত্রিয় সমিতির ২য় বার্ষিক অধিবেশনে রাজবংশীদের ব্রাত্যত্ব মোচন করে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব অনুসারে ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ২৭শে মাঘ তারিখে দিনাজপুর জেলার ডোমার থানার অন্তর্গত দেবলবাড়ি গ্রামে ক্ষত্রিয় মহামিলন দিবস উদ্‌যাপিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আসাম এবং উত্তরবঙ্গের নানা স্থান থেকে সমাগত প্রায় একুশ হাজার রাজবংশী ব্রাত্যত্ব মোচন করে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে এই অনুষ্ঠানের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে রাজবংশীরা ব্রাত্যত্ব মোচন এবং উপনয়ন সংস্কার গ্রহণের অনুষ্ঠান করতে থাকে। ২৭ শে মাঘ তারিখটি এভাবেই রাজবংশী সমাজের কাছে একটি স্মরণীয় দিবসের মর্যাদা পায় এবং এই সংস্কার কার্যের কেন্দ্রীয় পুরুষ হিসেবে পঞ্চানন বর্মাকে রাজবংশী সমাজে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বর্তমান উত্তরবঙ্গেও নানা স্থানে ঠিক ২৭ শে মাঘ তারিখটিতে রাজবংশীরা সমবেতভাবে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণের মাধ্যমে সেই দিনটিকে স্মরণ করে থাকে।[52] এইভাবে রাজবংশীরা তাদের ক্ষত্রিয়সমাজভুক্তির সম্পর্কিত দাবীর রূপায়ণের প্রাথমিক পর্বটি নিজেরাই সমাধা করে এবং অবশিষ্ট কাজটুকু সমাধা হয় ১৯১০ সালে তৎকালীন জনগণনা আধিকারিক ও'ম্যালের একটি রিপোর্টের মাধ্যমে। এই রিপোর্টে তিনি কোচ এবং রাজবংশীকে পৃথক পৃথক জাতি হিসেবে স্বীকার করেন।[53] বর্তমানে রাজবংশী সমাজ অনুন্নত জাতির তালিকাভুক্ত। সেনসাস রিপোর্টে জাতির ঘরে তাদের কেবল রাজবংশী লেখা হয় কিন্তু রিপোর্টে ক্ষত্রিয় বলে উল্লেখ করা হয়।

রাজবংশী সমাজের ক্ষত্রিয় সমাজভুক্তির আন্দোলনের এই ইতিহাস থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে আর্যীকরণের ধারায় এই প্রাচীন মানবগোষ্ঠী শুধু আর্য ভাষা ও সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করেই সন্তুষ্ট থাকেনি, আর্যদের সমান সামাজিক মর্যাদা লাভের একটি গূঢ় অভিপ্রায়ও তাদের ভিতরে দীর্ঘকাল থেকে সংগুপ্ত ছিল। এই অভিপ্রায় ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত এইভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

(৫২) বর্মণ উপেন্দ্র নাথ, রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৫৬-৬৭
(৫৩) ও'ম্যালে, এল, এস, এস, সেনসাস রিপোর্ট অব ইন্ডিয়া, ১৯১১, ভল্যুম-৫, পার্ট-১, পৃঃ ৪৪৫

দুটি আদিম মানবগোষ্ঠী নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিয়ে এভাবেই একটি গোষ্ঠীতে পরিণত হয় এবং বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে শেষ পর্বে এই মুক্তিগুলির ভিত্তিতে সম্পূর্ণরূপে একতাবদ্ধ হয়। রাজবংশী জাতির উদ্ভব ও বিবর্তন প্রসঙ্গে এখানেই এই ইতিকথার প্রাসঙ্গিক মূল্য নিহিত।

রাজবংশী জাতির আর্যীকরণ প্রসঙ্গে উপর্যুক্ত বৃত্তান্তে কথিত ঘটনাটি এই ধারার সর্বশেষ বিশেষত্ব-চিহ্নিত ঘটনা হলেও এই জাতির ভিতরে আর্যীকরণের সূত্রপাত কিন্তু বহু পূর্বেই ঘটেছিল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলাদেশে আর্যীকরণ শুরু হয় মৌর্য শাসনকালে, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে এবং গুপ্ত শাসনকালে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তা সমাপ্ত হয়। তাঁর মতে এই সময়ের মধ্যে আর্য ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতি সমগ্র বঙ্গদেশে প্রসার লাভ করে। এই মন্তব্যের সূত্রে বলা যায় যে বঙ্গদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে একই সময়ে উত্তরবঙ্গেও আর্যীকরণ শুরু হয়। এবং সাম্প্রতিক রাজবংশীদের পূর্ব-পুরুষরাও সেই সময় থেকে আর্যীকৃত হতে থাকে, যার সমাপ্তি ঘিন শতকের প্রথম ভাগে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে যে রাজবংশীরা আর্য ভাষাকে গ্রহণ করেছিল, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন মেলে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্যে। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর মন্তব্যের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশের অধিবাসীরা ভারতীয় আর্যভাষাকে নিজেদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিল।[54] হিউয়েন সাঙ সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতবর্ষে আসেন। বঙ্গ এবং কলিঙ্গ থেকে গঙ্গা পার হয়ে তিনি প্রথমে পুণ্ড্রবর্ধনে বা কেন্দ্রীয় উত্তরবঙ্গে আসেন। সেখান থেকে তিনি কামরূপে যান। তৎকালীন কামরূপের অধিবাসীদের সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য হ'ল এই যে কামরূপের অধিবাসীরা সরল, ব্যবহারে সৎ, ক্ষুদ্র আকৃতিবিশিষ্ট এবং পীতবর্ণের শারীর্যের অধিকারী। তাদের ভাষা সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে এই সব অধিবাসীদের ভাষা মধ্যভারতের ভাষা থেকে সামান্য পরিমাণে পার্থক্যযুক্ত।[55]

লক্ষণীয় যে হিউয়েন সাঙ পৌণ্ড্রবর্ধন বা কেন্দ্রীয় উত্তরবঙ্গের ভাষা সম্পর্কে কিছু বলেননি, কেবল কামরূপ বা সাম্প্রতিক পশ্চিম আসামের ভাষাকে মধ্যভারতের ভাষা থেকে ঈষৎ পার্থক্যযুক্ত ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সুতরাং এ অনুমান অসংগত নাও হতে পারে যে তৎকালীন পৌণ্ড্রবর্ধনের ভাষার সঙ্গে মধ্যভারতের ভাষার সাদৃশ্য বশতঃই তিনি সেই প্রসঙ্গে ভাষা সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। এই অনুমান থেকে অতঃপর এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগেই কেন্দ্রীয় উত্তরবঙ্গে ভারতীয় আর্য-ভাষা অবিকৃতভাবেই গৃহীত হয়েছিল। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ভারতীয় আর্যভাষায় যে উচ্চারণ-বৈষম্য বাংলা থেকে অসমীয়াকে পৃথক করেছে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ আসামের পশ্চিমাঞ্চলে যা

---

(৫৪) চ্যাটার্জি সুনীতি কুমার, দি ওরিজিন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ, ১৯৭৫ অধ্যায়-২, পৃঃ ৭৭-৭৯

(৫৫) বিল, এস, রেকর্ডস অব দি ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড, লন্ডন, ১৯০৬, পৃঃ ১৯৪ এফ, এফ,

কামরূপের অধিবাসীদের মুখে ভারতীয় আর্যভাষার সেই ঈষৎ ভিন্নতাযুক্ত উচ্চারণই শুধু শুনে থাকবেন, যা থেকে তাঁর মনে হয়েছিল যে কামরূপের ভাষার সঙ্গে মধ্যভারতের ভাষার কিছু পার্থক্য আছে।৫৬ সুতরাং অতঃপর বাংলাদেশে আর্যভাষার অধিগ্রহণ সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমতকে পুরোপুরি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই এবং তার সঙ্গে একথাও যোগ করা যেতে পারে যে তৎকালীন কামরূপ এবং উত্তরবঙ্গের অধিবাসী রাজবংশীরাও আচার্য সুনীতিকুমার কর্তৃক নিরূপিত সময়সীমার মধ্যেই আর্যভাষাকে সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করতে পেরেছিল।

পরিশেষে তথ্য, প্রমাণ এবং যুক্তির উপরে ভিত্তি করে রাজবংশী জাতির উদ্ভব সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচ্ছে যে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগে পৌণ্ড্রবর্ধন থেকে দ্রাবিড় বা পৌণ্ড্রক ক্ষত্রিয়দের একটি অংশ তৎকালীন কামরূপ, সাম্প্রতিক উত্তরবঙ্গে এসে বসবাস শুরু করে। এর কিছুকাল পরে, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে তিব্বত-চীনা গোষ্ঠীর অন্তর্গত বৃহৎ বোড়ো শাখার তিব্বত-ব্রহ্মভাষী কোচ, মেচ, বোড়ো, কাছারি, রাভা ইত্যাদি উপজাতির লোকেরা উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে। এই উপজাতিগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে। কিন্তু একটি অংশ, যারা অপেক্ষাকৃত কম রক্ষণশীল, দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকদের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি সমন্বিত জন গঠন করে। এই সমন্বিত জনই হ'ল সাম্প্রতিক উত্তরবঙ্গের অধিবাসী রাজবংশী সমাজ, যাদের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে আর্যদের রক্তগত সংমিশ্রণ ঘটে থাকতে পারে বলে অনুমান করা যায়। সুপ্রাচীন কাল থেকে এই জনের অন্তর্ভুক্ত মানুষেরা আর্যভাষা এবং সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করার চেষ্টা করে চলেছে, এবং এই আর্যীকরণের প্রাথমিক পর্যায়ে, খ্রীষ্টপর সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই ভারতীয় আর্যভাষাকে নিজেদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে পেরেছে। কিন্তু ধর্ম এবং সংস্কৃতির দিক থেকে আর্যীকরণের স্রোত এই মানবগোষ্ঠীর মধ্যে এখনও প্রবহমান। শিক্ষাবিস্তার এবং বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগস্থাপন, এই দুটি উপায়ে সাম্প্রতিক কালে এই গোষ্ঠীর লোকেরা একটি পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্য দিয়ে আত্মবিস্তার করে চলেছে।

---

(৫৬) চ্যাটার্জি সুনীত কুমার, দি ওরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ, ১৯৭০ ভল্যুম-১, পৃঃ ৭৯

বাংলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় এ পর্যন্ত শিষ্ট বা সাহিত্যিক বাংলাই ভাষাতাত্ত্বিকদের কাছে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন, দ্বিজেন্দ্র নাথ বসু প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিকরা মূলতঃ শিষ্ট বা সাহিত্যিক বাংলাকেই আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে বাংলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করেছেন।[৫৭] অবশ্য বাংলার বিভিন্ন উপভাষা সম্পর্কে তাঁরা যে একেবারে নীরব একথাও বলা যায় না। এ সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত-ভাবে কিছু আলোচনা হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় যে কোনো আলোচনাতেই সবগুলি উপভাষার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য সামগ্রিক নির্ধারণের চেষ্টা হয়নি। অর্থাৎ উপভাষা সমূহের ইতিহাস এবং বৈশিষ্ট্য সহ পূর্ণাঙ্গ আলোচনার অভাব শেষ পর্যন্ত থেকে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গের অধিবাসী রাজবংশী সমাজে ব্যবহৃত ভাষাও একারণেই অদ্যাবধি প্রায় একটি অনালোচিত বিষয়। এ সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ চোখে পড়ে জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন-এর সমীক্ষায়। তিনিই সর্বপ্রথম রংপুর এবং এই জেলার উত্তর-পূর্ব প্রান্তবর্তী জেলা দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চল, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আসামের গোয়ালপাড়া জেলার অধিবাসী রাজবংশী সমাজে ব্যবহৃত ভাষাকে একটি স্বতন্ত্র উপভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে যেহেতু প্রধানতঃ রাজবংশীরাই এই ভাষা ব্যবহার করে তাই সাধারণভাবে এটিকে রাজবংশী ভাষা বলা হয়। কিন্তু এটি আসলে বাংলারই একটি উপভাষা।[৫৮] গ্রীয়ারসনের যেষোক্ত সিদ্ধান্তটি যে সঠিক আলোচনার অগ্রগতিতে তা প্রমাণিত হবে। কিন্তু আলোচ্য উপভাষাটির ভৌগোলিক পরিসীমা নির্দেশের ক্ষেত্রে তাঁর অভিমত অসম্পূর্ণ। অবিভক্ত বাংলা দেশের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, পার্বত্য অঞ্চলগুলি বাদে দার্জিলিং, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, বিহারের পূর্ণিয়া জেলার উত্তর-পূর্বাংশ, নেপালের ঝাপা জেলার কিছু অংশ এবং আসামের গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলার কিছু অংশেও রাজবংশীরা বসবাস করে। উল্লিখিত অঞ্চলসমূহে প্রচলিত তাদের মুখের ভাষায় অঞ্চলবিশেষে ধ্বনিগত এবং রূপগত কিছু বৈসাদৃশ্য থাকলেও মূল কাঠামো মোটামুটিভাবে সর্বত্রই এক রকম। বর্তমান গবেষণার জন্য নির্বাচিত সমীক্ষার ক্ষেত্র মূলতঃ উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা হলেও সাম্প্রতিক বাংলা-দেশের রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ইত্যাদি জেলা থেকে আগত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারও গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া উত্তরবঙ্গের প্রতিবেশী রাজ্য আসাম, নেপাল এবং বিহারের পূর্বোক্ত অঞ্চলগুলিতেও সমীক্ষা চালানো হয়েছে। পরিশেষে এই সমীক্ষার ভিত্তিতে এই মত গ্রহণ করা হয়েছে যে উত্তরবঙ্গের বাইরেও এই সমস্ত অঞ্চলে রাজবংশীদের দ্বারা ব্যবহৃত ভাষারূপটি প্রচলিত। সুতরাং অতঃপর একথা নিঃসংশয়িতভাবে

---

(৫৭) ক) চ্যাটার্জি সুনীতি কুমার, দি ওরিজিন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ, ১৯৭৫
খ) সেন সুকুমার, ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৭৫ গ) বসু দ্বিজেন্দ্রনাথ, বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা ১৯৭৫

(৫৮) গ্রীয়ারসন, জি, এ, লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া, ১৯৬৮, ভল্যুম-৫, পার্ট-১, পৃঃ ৬৮, ১৬৩

বলা যেতে পারে যে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে ব্যবহৃত উপভাষার ভৌগোলিক সীমা নির্দেশের ক্ষেত্রে গ্রীয়ারসনের সিদ্ধান্ত অংশতঃ অসম্পূর্ণ।

গ্রীয়ারসনের মতানুসারে দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চলে রাজবংশীদের মধ্যে প্রচলিত ভাষার একটি আঞ্চলিক বিভাষা রয়েছে, যাকে তিনি 'বাহে উপভাষা' নামে চিহ্নিত করেছেন।[৫৯] তাঁর এই সিদ্ধান্তও যুক্তিসহ নয়। দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চলের রাজবংশীদের ভাষায় উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের রাজবংশীদের ভাষার কিছু পরিমাণ স্বাতন্ত্র্য রয়েছে একথা সত্য। আমাদের সমীক্ষায় এই স্বাতন্ত্র্য আমরাও লক্ষ্য করেছি। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র উপভাষার পরিকল্পনা বা উল্লিখিত উপাদান বৈচিত্র্যের জন্য একটি অঞ্চলের ভাষাকে স্বতন্ত্র বিভাষা হিসেবে চিহ্নিত করা সঙ্গত নয়। আর যদি যুক্তির খাতিরে একথা মেনেও নেওয়া হয় যে এই স্বাতন্ত্র্যের জন্য দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চলের রাজবংশীদের ভাষা একটি স্বতন্ত্র বিভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য, তথাপি এর নামকরণ সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ কিন্তু থেকেই যায়। আমাদের সমীক্ষালব্ধ তথ্য অনুসারে 'বাহে' রাজবংশীদের ভাষায় একটি সম্বোধন পদ। পিতৃস্থানীয় এবং মাতৃস্থানীয়রা পুত্রস্থানীয় এবং কন্যাস্থানীয়দের সম্বোধন করার সময় এবং অনুরূপভাবে পুত্রস্থানীয় এবং কন্যাস্থানীয়রা পিতৃস্থানীয় এবং মাতৃস্থানীয়দের সম্বোধন করার সময় এই পদটি দ্বারা সম্বোধন করে। ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য থেকে মনে হয় পদটি উভয়লিঙ্গবাচক। তুলনীয় বাংলা সম্বোধনপদ 'বাপুহে'। তবে এই অনুমানই সঙ্গত যে বাংলা সম্বোধনপদ 'বাবাহে' থেকেই বাহে শব্দটি নিষ্পন্ন। এই বিষয়ে একটি বিকল্প অনুমানও করা যায়। প্রতিবেশী জনগোষ্ঠী কোচ-রাভাদের সঙ্গে দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করার ফলে কোচ রাভা ভাষার অনেক শব্দ প্রায় অবিকৃতভাবেই রাজবংশীদের ভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। কোচ-রাভা ভাষায় 'বায়' শব্দটির অর্থ হ'ল বন্ধু বা দেবতা। আমাদের অনুমান, এই শব্দটি রাজবংশীদের ভাষায় গৃহীত হওয়ার পরে তার সঙ্গে বাংলা সম্বোধনপদ 'হে' যুক্ত হয়ে শব্দটি প্রথমতঃ 'বায়হে' এবং সবশেষে 'বাহে', এই রূপ নিয়েছে। কোনো কোনো স্থানে বাহে-এর পরিবর্তে 'বায়' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়। উল্লিখিত দুটি অনুমানের মধ্যে কোনটি সমর্থনযোগ্য এবিষয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু বাহে যে একটি সম্বোধনপদ মাত্র এবিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। সুতরাং বাহে নামে একটি অঞ্চলের উপভাষাকে চিহ্নিত করার বিষয়টি যে যুক্তিযুক্ত নয় একথা শেষ পর্যন্ত বলা যায়।

বাংলা এবং তার উপভাষাগুলির নামকরণের দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায় যে এই নামকরণ মূলত আঞ্চলিক ভৌম কাঠামোর উপরে ভিত্তি করেই করা হয়েছে। ভাষা বা উপভাষার নামগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভাষা বা উপভাষার নামকরণের ক্ষেত্রে আর একটি পদ্ধতি অনুসৃত হতে দেখা

---

(৫৯) তদেব, পৃঃ ১৮

যায়। এই পদ্ধতি অনুসারে সাধারণতঃ বাচকগোষ্ঠীর নাম অনুসারেই ভাষার নামকরণ করা হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হ'ল এই যে দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চলে বাহে নামে কি কোনো সম্প্রদায় আছে, যার নামানুসারে তাদের ভাষার নাম 'বাহে উপভাষা' হতে পারে? এই প্রসঙ্গে একটি তথ্যের উল্লেখ এখানে প্রয়োজন। রাজবংশীদের মুখে বাহে শব্দটির প্রয়োগের আধিক্য লক্ষ করে পূর্ব এবং দক্ষিণবঙ্গ থেকে আগত অনেকেই রাজবংশীদের 'বাহে জাতি' বলে ভুল করে থাকেন। কিন্তু পূর্বোক্ত আলোচনার নিরিখে একথা স্পষ্ট হয়েছে যে অঞ্চল নির্বিশেষে সমগ্র রাজবংশী সমাজে বাহে একটি সম্বোধনপদ, বাহে নামে কোনো পৃথক সম্প্রদায় দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চলে নেই। রাজবংশীদের মধ্যেও বাহে নামে কোনো সামাজিক উপবিভাগ নেই। সুতরাং যদি ধরে নেওয়া যায় যে গ্রীয়ারসন ভাষার নামকরণের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসারে দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চলের ভাষার নামকরণ করেছেন তাহলেও বলতে হয় যে এক্ষেত্রে তাঁর প্রচেষ্টা সঠিক নয়।

গ্রীয়ারসনের এই ভ্রান্তির একটি সম্ভাব্য কারণ এখানে নির্দেশিত হচ্ছে। গ্রীয়ারসন মূলতঃ বিভিন্ন স্তরের সরকারী কর্মচারীদের সাহায্যে তাঁর সমীক্ষার উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। ভারতের সমস্ত অঞ্চলে যাওয়া তাঁর পক্ষে যে সম্ভব হয়ে ওঠেনি একথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এমন হয়ে থাকতে পারে যে দক্ষিণ অথবা পূর্ববঙ্গ থেকে আগত কোনো বাঙালী তাঁকে উত্তরবঙ্গের ভাষা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেছিলেন, যিনি তরাই অঞ্চলের রাজবংশীদের মুখে বাহে শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করে তাদের বাহে বলে ভুল করেছিলেন। আর গ্রীয়ারসন যে রাজবংশীদের দ্বারা ব্যবহৃত ভাষাকে প্রথমতঃ রাজবংশী ভাষা বলে চিহ্নিত করেছিলেন একথা ইতোপূর্বে একবার উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রেও তিনি যে বাচকগোষ্ঠীর নাম অনুসারে ভাষার নামকরণ করবেন এটাই স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ একারণেই গ্রীয়ারসন দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চলের রাজবংশীদের উপভাষাকে বাহে উপভাষা বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রাজবংশীদের ভাষা সম্পর্কে প্রথম সমীক্ষকের মর্যাদা গ্রীয়ারসনেরই প্রাপ্য। বর্তমান নিবন্ধে তাঁর সিদ্ধান্তের শেষ অংশকে সমর্থন করে, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজে ব্যবহৃত ভাষাকে বাংলা ভাষারই একটি উপভাষা হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা করা হবে।

সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ রেখে বাংলা ভাষাকে চারটি প্রধান উপভাষায় বিভক্ত করেছেন। তাঁর বিভাজন অনুসারে রাঢ়, বরেন্দ্র, কামরূপ এবং বঙ্গ, বাংলা-ভাষার এই চারটি উপভাষা রয়েছে।[60] সুকুমার সেনের মতে বাংলা ভাষার উপভাষা পাঁচটি। এই উপভাষাগুলি হ'ল ১) রাঢ়ী, ২) ঝাড়খণ্ডী, ৩) বরেন্দ্রী, ৪) বঙ্গালী ও ৫) কামরূপী।[61] দেখা যাচ্ছে যে

---

(৬০) চ্যাটার্জি সুনীতিকুমার, দি ওরিজিন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাংগুয়েজ, ১৯৭৫, ভল্যুম-১, পৃঃ ১৩৮-১৪০

(৬১) সেন সুকুমার, ভাষার ইতিবৃত্ত, ১৯৭৫, পৃঃ ১৮৪

উপভাষা বিভাজনের ক্ষেত্রে দুজনের মধ্যে সামান্য পরিমাণে মতপার্থক্য রয়েছে। কিন্তু উপভাষাগুলির ভৌগোলিকসীমানির্দেশের ক্ষেত্রে দুজনের মতে কোনো পার্থক্য নেই। অন্ততঃ কামরুপী উপভাষার ভৌগোলিক সীমানির্দেশ দুজনের ক্ষেত্রে একই রকম। তদনুসারে এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া চলে যে গ্রীয়ারসন কথিত 'স্বতন্ত্র উপভাষা' বা রাজবংশীদের ভাষাই হ'ল কামরুপী উপভাষা। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে বলা যেতে পারে যে প্রকল্পভুক্ত মানবগোষ্ঠীটির ব্যবহৃত ভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ বাংলাভাষার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ বাংলাভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস ও রাজবংশীদের ব্যবহৃত ভাষার উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশের ইতিহাস অংশতঃ অভিন্ন। সুতরাং একারণেই আলোচ্য ভাষাটির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত আলোচনা শুরু করার আগে বাংলা ভাষার বহু আলোচিত উৎপত্তির ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রয়োজন।

গ্রীয়ারসন এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলাভাষার উৎপত্তি হয়েছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহের মতানুসারে প্রাচ্য বৈয়াকরণদের দ্বারা কথিত 'গৌড়ী অপভ্রংশ'থেকেই বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটেছে। উল্লিখিত এই দুটি মতের মধ্যে দ্বিতীয়োক্ত মতটির যৌক্তিকতা আলোচনা সাপেক্ষ। বাংলা-ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং গ্রীয়ারসনের মতটিই পরবর্তীকালের ভাষাতাত্ত্বিকদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে। কারণ প্রমাণিত হয়েছে যে বাংলাভাষা নব্যভারতীয় আর্যস্তরে এসে তার নিজস্ব রুপ পরিগ্রহ করেছে। মধ্যভারতীয় আর্য হ'ল এর পূর্বস্তরের ভাষা। আর সংস্কৃত ভাষা হ'ল প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষারই একটি শিষ্ট এবং বিধিবদ্ধ রুপ। অতএব সংস্কৃতের পরে অন্ততঃ কয়েকটি স্তর অতিক্রম করার পরে যে বাংলা ভাষার উদ্ভব এ সম্পর্কে দ্বিমতের আর কোনো কারণ থাকে না। আর একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তা হ'ল এই যে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচ্য রুপ থেকে বাংলাভাষা বিবর্তিত, কিন্তু সংস্কৃত প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার এই শাখার শিষ্ট রুপ নয়। তা মধ্যাঞ্চলীয় প্রাচীনভারতীয় আর্যভাষার শিষ্ট রুপ। মাগধী প্রাকৃত থেকেও যে বাংলাভাষার উৎপত্তি নয় এই যুক্তির সমর্থনে বলা যেতে পারে যে প্রাকৃত হ'ল মধ্যভারতীয় আর্যভাষার প্রথম স্তরের ভাষা। পক্ষান্তরে বাংলার উৎপত্তি যে অপভ্রংশ থেকে তা মধ্য-ভারতীয় আর্যের তৃতীয় স্তরের ভাষা। সুতরাং পরিশেষে এই সিদ্ধান্তই ভাষাতাত্ত্বিকরা গ্রহণ করেছেন যে মধ্যভারতীয় আর্যভাষার পূর্বী শাখার মাগধী প্রাকৃতের পরবর্তী স্তরে গৌড়দেশী অপভ্রংশের সামনে মাগধী মাগধী অপভ্রংশের উদ্ভব ঘটে। সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে ভোজপুর, মিথিলা, মগধ, বাংলাদেশ, উড়িষ্যা ও আসামে এই অপভ্রংশ ভাষা পরস্পর নিরপেক্ষ কতকগুলি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে থাকে। দশম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে এই বৈশিষ্ট্যগুলি অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবং এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে উল্লিখিত অঞ্চলগুলিতে মাগধী অপভ্রংশের কতিপয় প্রাদেশিক রুপের উদ্ভব ঘটে। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে এই প্রাদেশিক

রূপগুলিই হ'ল বাংলা, অসমীয়া, ভোজপুরী, মৈথিলী, উড়িয়া ইত্যাদি প্রাদেশিক ভাষা।

কিন্তু এবিষয়টি একটু স্বতন্ত্রভাবে বিবেচ্য। ভাষাতাত্ত্বিকরা মনে করেন যে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যে মাগধী অপভ্রংশের এই প্রাদেশিক রূপগুলির গঠন সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু আমরা মনে করি যে মাগধী অপভ্রংশের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় বিবর্তনের পর্বটি দশম শতাব্দীর মধ্যেই শেষ হয়ে যায়নি, ঐ সময়ের পরেও কিছুকাল ধরে তা চলেছিল। চর্যাপদের ভাষাকে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রমুখ ভাষাতাত্ত্বিকরা প্রাচীন বাংলা বলে প্রমাণ করেছেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে চর্যাপদকে প্রাচীন বাংলার নিদর্শন বলে ধরা হয়। এই সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য সম্পর্কে যে কোনো প্রশ্নেরই অবকাশ নেই একথা সর্বথাই স্বীকার্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বিবেচ্য যে চর্যার ভাষার সঙ্গে বাংলার প্রতিবেশী একাধিক ভাষার নিকট সাদৃশ্য রয়েছে। এই সাদৃশ্য বাংলার চেয়ে বেশী, না প্রতিবেশী অন্যান্য ভাষাগুলির চেয়ে বেশী, এ প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। তবে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য একান্তভাবেই বাংলার নিজস্ব, প্রতিবেশী অন্যান্য ভাষায় যেসব বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত তা যে চর্যায় উপস্থিত এ সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তথাপি এই সাদৃশ্যের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত একপ্রকার অনিবার্য হয়ে ওঠে যে চর্যাপদের যুগে (যদি এর রচনাকাল দশম শতাব্দীর মধ্যে হয়) পূর্ব ভারতে মাগধী অপভ্রংশের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় রূপান্তর সম্পূর্ণ হয়নি। মগধ, মিথিলা, বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা ইত্যাদি স্থানের ভাষায় মাগধী অপভ্রংশের কিছু সাধারণ মৌলিক বৈশিষ্ট্য তখনও বর্তমান ছিল। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিই চর্যায় প্রতিফলিত হয়েছে। এ কারণেই চর্যার ভাষার সঙ্গে অসমীয়া, উড়িয়া, ভোজপুরী ইত্যাদি ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং আমরা মনে করি যে একটি স্বতন্ত্র প্রাদেশিক ভাষা হিসেবে বাংলার গঠন খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে নয়, তারও কিছুকাল পরে সম্পূর্ণ হয়েছে।

রাজবংশী জাতির উৎপত্তি বিষয়ক আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগে দ্রাবিড় বা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়রা, এবং খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতক বা তারও কিছু পরে তিব্বত-ব্রহ্মভাষী মোঙ্গোলীয়ান গোষ্ঠীর একটি শাখা উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে এবং কালক্রমে একটি অখণ্ড মানবগোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে আর্যীকরণের সম্মুখীন হয়। আর্যীকরণের এই ধারায় এই সমন্বিত মানবগোষ্ঠী তাদের পূর্বতন ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করে আর্যসুলভ ধর্মীয় আচার এবং বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে যেমন গ্রহণ করেছে, তেমনি ভাষার ক্ষেত্রেও তাদের পূর্বতন ভাষার পরিবর্তে ভারতীয় আর্যভাষাকে নিজেদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে। ভাষার ক্ষেত্রে এই গ্রহণ বর্জনের বিষয়টি সম্পর্কে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর মন্তব্য এবং সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের অভিমতকে স্বীকার করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে খ্রীষ্টের সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই এই

মানবগোষ্ঠী, সাম্প্রতিক রাজবংশীদের পূর্বপুরুষরা মধ্যভারতীয় আর্যভাষার তৃতীয় স্তরের ভাষা মাগধী অপভ্রংশকে নিজেদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। অবশ্য তাদের ব্যবহারে মাগধী অপভ্রংশ যে ধ্বনিগত এবং রূপগত দিক থেকে কিছু পরিমাণে স্বাতন্ত্র্যযুক্ত হয়ে পড়েছিল হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণ বিবরণ থেকেই তা জানা গিয়েছে। এ সম্পর্কে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের যুক্তিকে সমর্থন করে আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে আলোচ্য মানবগোষ্ঠীটির ব্যবহারে মাগধী অপভ্রংশ যে স্বতন্ত্র রূপটি পরিগ্রহ করেছিল তা আসলে মাগধী অপভ্রংশেরই একটি আঞ্চলিক রূপ। অতঃপর পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের অনুবর্তী আর একটি সিদ্ধান্ত এখানে যোগ করা যেতে পারে; বলা যেতে পারে যে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের মধ্যেই মাগধী অপভ্রংশের অঞ্চলভিত্তিক বিবর্তন শুরু হয়েছিল। হিউয়েন সাঙ কামরূপে মাগধী অপভ্রংশের সেই অঞ্চলের বিবর্তিত রূপটিকে দেখেই উল্লিখিত মন্তব্য করেছিলেন।

পরিশেষে আলোচ্য উপভাষাটির উদ্ভব বিষয়ক আলোচনার উপসংহারে প্রদর্শিত সমস্ত যুক্তি, তথ্য, ও প্রমাণের উপরে নির্ভর করে আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই রাজবংশীদের পূর্বপুরুষরা বাংলা ভাষার অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্তরের ভাষা মাগধী অপভ্রংশকে নিজেদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। অবশ্য এই গ্রহণ বর্জনের কাজ যে অনেক আগেই শুরু হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় রাজবংশীদের ভাষায় মধ্যভারতীয় আর্যের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কিছু বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি থেকে। তবে এই সিদ্ধান্ত মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য যে পূর্বকথিত সময়সীমার মধ্যেই রাজবংশীরা আর্য ভাষাকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করে। তারপরে বাংলাভাষা বিভিন্ন অঞ্চলে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য নিয়ে যেভাবে বিবর্তিত হয়েছে রাজবংশীদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা পরিগৃহীত ভাষাটিও প্রায় সেই একই নিয়মে নিজস্ব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু তার এই বিবর্তন রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতার জন্য মধ্যবাংলা স্তর পর্যন্ত এসে থেমে গিয়েছে। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে বিবর্তনের স্রোত এখনও অব্যাহত গতিতে বয়ে চলেছে। উনিশ শতকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র হিসেবে কলকাতার গুরুত্ব অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় কলকাতা এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলের একাধিক উপভাষার বৈশিষ্ট্যকে আত্মস্থ করে জন্ম নিয়েছে শিষ্ট বা সাহিত্যিক বাংলা, যা তার নিজস্ব গুণে সমগ্র বঙ্গদেশের শিষ্ট সমাজের ভাষা হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। অন্যপক্ষে বঙ্গদেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলের অধিবাসী রাজবংশীদের ভাষা, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক-দিক থেকে এই অঞ্চলের গুরুত্বহ্রাসের ফলে বিবর্তনের পথে আর অগ্রসর হতে পারেনি। ফলে বাংলার মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্য, যা সম্প্রতি বাংলাভাষার ঐতিহাসিক উপাদানে পর্যবসিত, তা এই অঞ্চলের ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য।